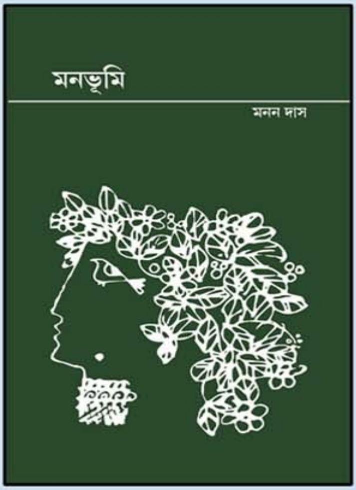
কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

শারদীয়া ১৪২৫



অসদো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।।



মনভূমি

মনন দাস

একটি মননশীল উপন্যাস

নির্বাস হেঁটে যাই কোনো কোনো সময় স্বপ্ন মধ্যে। চার পাশে নির্জন বনভূমি। পায়ের নীচে কখনো ঘাস কখনো মাটি। কিছু কিছু শব্দ শুনি পাখিদের।কিছু কিছু শব্দ শুনি ঝরনার। আলোতে সবুজ ছায়া....

মনে হয় কাকে যেন খুঁজতে বেরিয়েছি। হাঁটতে হাঁটতে গভীর হতে গভীরতর অরণ্যে হারিয়ে যাই।বুকে অঙ্কুরোদ্গমের মতো ব্যথা। সহসা দেখি তুমি অরণ্যে নির্জনে সবুজ ছায়ায় পবিত্র পুষ্পের মতো ফুটে আছো। তখন বুঝতে পারি সব তৃষ্ণা একাগ্র হলে বুকে অঙ্কুরোদ্গমের ব্যথা জন্ম নেয়...

লিপিকা

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা ৭০০০০৯

কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

শারদীয়া ১৪২৫

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা - ৭০০ ০০৯
krishnupatrika@gmail.com

প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক

রথীন কর

এর সাম্প্রতিক প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ

কবিতা

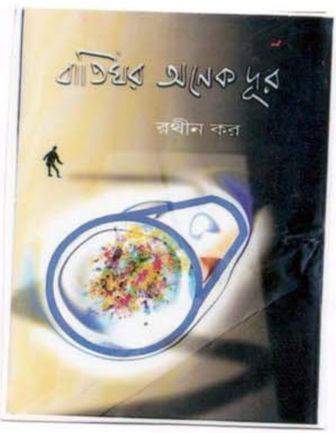
বিষাদ কর্নেট বাজে - পত্রলেখা - ৪০.০০ টাকা
মৃদুল রোদ্দুরে একা - সংস্কৃতিক খবর - ৪০.০০ টাকা
বাতিঘর অনেক দূর - কৃষ্ণসীস প্রকাশন - ৪০.০০ টাকা
Moments' Monuments - Pathak - Rs. 100.00

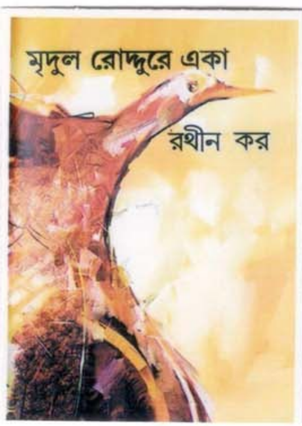
প্রবন্ধ সংকলন

বিবিধ প্রসঙ্গ অব্যয় ৩০.০০ টাকা

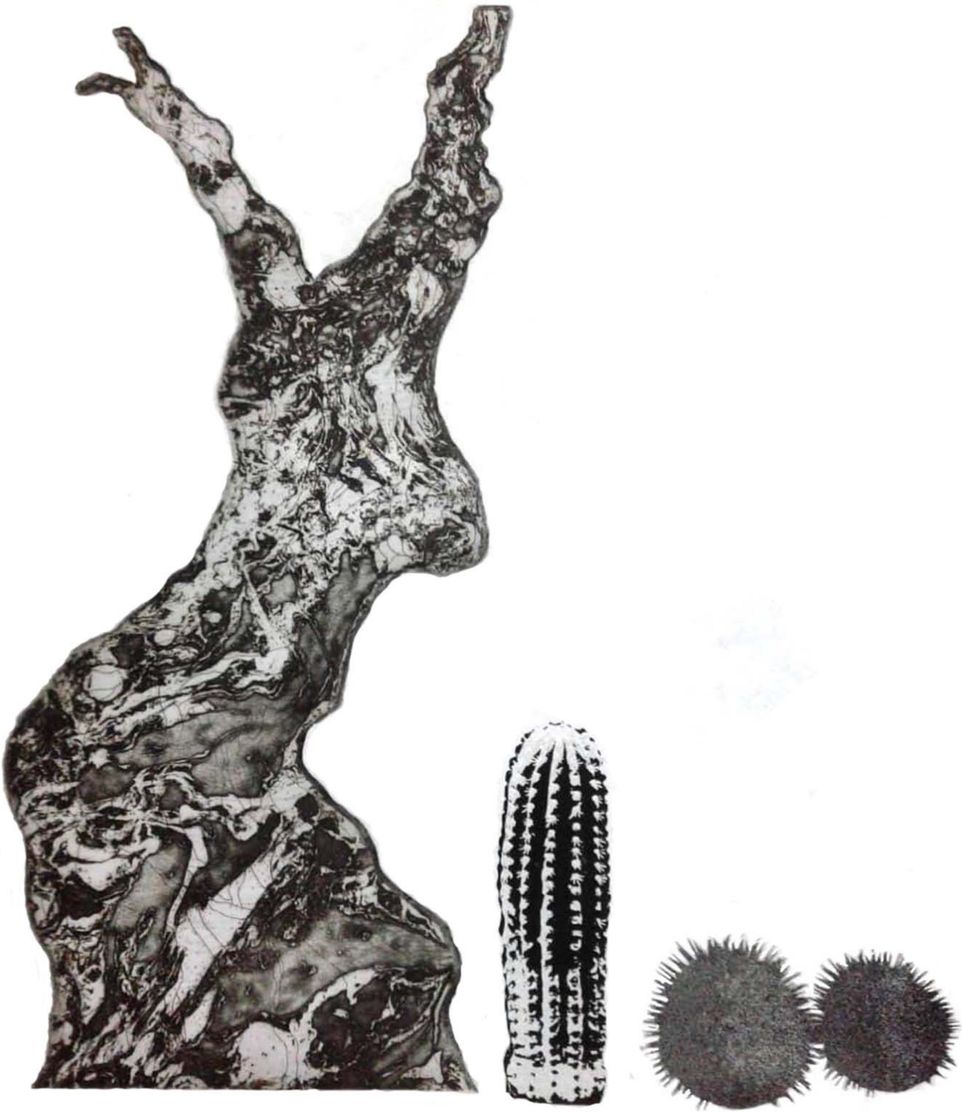
প্রাপ্তিস্থান :
একুশ শতক, পাঠক, ধ্যানবিন্দু,
(কলেজস্ট্রীট এলাকা, কলকাতা)

ই-বই





https://archive.org/details/BatigharAnekDur
https://archive.org/details/MridulRoddureEka



শিল্পী - পৌলমী সেনগুপ্ত
মূল ছবি - ৫০সেমি X ৩৬ সেমি

উৎসর্গ :



৺রেখা বোস

জন্ম : মার্চ ১৯৪৭ মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল ২০১৮

এর স্মৃতির উদ্দেশে

শ্যামল বোস (স্বামী)

(কৃশানুর আদি সদস্য)

অপর্ণা ঘোষ (কন্যা) সুপর্ণা দাস (কন্যা)

বাসব ঘোষ (জামাতা) কাজল দাস (জামাতা)

শ্রেয়সী ঘোষ (পৌত্রী) অর্কপ্রভ দাস (পৌত্র)



কৃশানু

শারদ ১৪২৫

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছড়া

গল্প

ভ্রমণ

প্রবন্ধ

পুস্তক পরিচয

সম্পাদক : **মনন দাস**

প্রচার ও জনসংযোগ : **সমীর বেতাল,** *কম্পিউটার গ্রাফিক্স :* **প্রদীপ মণ্ডল,**
স্কেচ : **পৌলমী সেনগুপ্ত**

অসদো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

সাহিত্য : মানবের এক অনবদ্য সৃষ্টি। সাহিত্য অনুভবকে বিকশিত করে, চেতনাকে প্রসারিত করে। সাহিত্য মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনে জ্যোতির্ময় করে তোলে। অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাওয়ার পথ হল সাহিত্য।

কৃশানু পত্রিকা দীর্ঘ একান্ন বছর ধরে সাহিত্যের বিকাশে অনলস পরিশ্রম করে চলেছে।

সাহিত্য চর্চার জন্য প্রয়োজন যে জমিন—বর্তমানে বাংলায় বড় বড় সেসব পত্রিকা খুবই সামান্য। লিট্‌ল ম্যাগাজিন সেই স্থানটা পূরণ করে। কৃশানু সেই আদর্শে কাজ করে চলেছে, কৃশানু মূলত নবীন লেখকদের মুখপত্র।

সাহিত্য ক্ষেত্রে ক্রমশ মুছে যাচ্ছে দুই বাংলার বিভাজন রেখা। ইন্টারনেট সেই কাজটিকে আরও সহজ করে দিয়েছে। অনায়াসে বাংলাদেশ থেকে চলে আসছে লেখা, কৃশানুও মর্য্যাদার সঙ্গে তাদের স্থান দিচ্ছে বুকে। কৃশানুর ই-বই সহজেই দূরদেশ থেকে পড়তে পারছেন কবি সাহিত্যিক ও পাঠকরা।

বাংলা ভাষা পৃথিবীতে আজ গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। কৃশানু পত্রিকাও সেই মর্মে কাজ করে চলেছে। কৃশানু দীর্ঘজীবি হোক। জয় কৃশানুর জয়, জয় বাংলা ভাষার জয়।

—মনন দাস

প্রখ্যাত কবি

অমর কুমার দাস - এর

কাব্যমঞ্জরী

রৌদ্রস্নাত মানুষ ১৯৮৭
শব্দের সুখ দুঃখ ১৯৯১
ছড়রা এবং ছড়রা ১৯৯১
হৃদয় খুঁড়েছি অন্ধকারে ২০০১
আজ শ্রাবণে ২০০৮
আজ বোশেখে ২০০৯
শ্রাবণ দিনে ২০০৯
একশো পঞ্চাশের বোশেখে ২০১০
যাঁর মৃত্যু নেই ২২ শে শ্রাবণ ২০১০
একশো পঞ্চাশ পেরিয়ে ২০১১
আজ ২২ শে শ্রাবণ ২০১১
প্রবাহ ২০১২
প্রস্রবণ ২০১২
পরিশুদ্ধ পা ২০১৩
ভাসান ২০১৩
দহন ২০১৩

লজ্জা ২০১৩
একটি আলোর গল্প ২০১৪
২৫ শে বৈশাখ-একটি উচ্চারণ ২০১৪
প্রয়াস ২০১৪
প্রশ্রয় ২০১৪
তোমাকে ২০১৫
সুরঞ্জনা তোমাকে ২০১৫
বিবর্তন ২০১৬
শপথ ২০১৬
আলোর ধারা ২০১৭
পরমা ২০১৭
একটা দিন ২০১৭
এখন সময় ২০১৮
নাগরিক ২০১৮
কবিতার পাদদেশে কবি ২০১৮





প্রাপ্তিস্থান : লিপিকা, ৩০/১ এ, কলেজ রো, কোলকাতা ৭০০০০৯
শব্দের ঝংকার পত্রিকা দপ্তর, সালকিয়া
পুস্তক ভবন, কাকদ্বীপ
আদ্যামা বুক ষ্টল কাকদ্বীপ

অনুভব

আশিস সান্যাল

ঝরছে নিরালা রোদ
চারদিকে পাখিদের শুনি কলরব।
এখন কোথায় তুমি?
কোনখানে শুয়ে আছো সম্পূর্ণ নীরব?
হৃদয় বিক্ষত আজ
তুমিহীন শূণ্যতায় শুধু প্রতিধ্বনি,
সর্বত্র তোমার নামে
বাতাসের প্রতিশব্দ কান পেতে শুনি।

ভোরের বিজনে আজ
ঝরে যেন নিরিবিলি সোনালি আলোক,
এখন প্রার্থনা তাই
সব আশা স্বাভাবিক পুষ্পবতী হোক।
সফেন সমুদ্র থেকে
শুরু হোক মায়াবতী মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়।
পৃথিবী নির্মল হোক
মাটি হোক সবখানে এখন উর্বর।

প্রেমিক প্রেমিকা আজ
নির্ভয়ে দাঁড়াক এসে হাতে রেখে হাত।
অন্ধকার চূর্ণ করে
কেটে যাক কুয়াশার অভিশপ্ত রাত
সবাই নির্ভয়ে এসো
উদ্ভাসিত প্রত্যাশায় স্বপ্নময় বলি :
পৃথিবী সুন্দর হোক
তোমার দু'হাতে দেবো শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

সময়টা দ্রুত বদলে যাচ্ছে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সময়টা দ্রুত বদলে যাচ্ছে মনে হয় আজ,
ভয়ানকভাবে বদলে যাচ্ছে মানব সমাজ।
চারপাশে আজ নামছে কি ধ্বস মানবিকতার?
টি. ভি. সিরিয়ালে, আর মুঠোফোনে এতোদিনকার
জীবনের নীতি, গতি ও প্রগতি ধরে দিলো টান;
আর তারই সাথে চলছে এ কোন অনুসন্ধান?
বিজ্ঞান আজ জ্ঞানের জগতে করে তোলপাড়;
সৃষ্টির গতি বৃদ্ধিতে আছে সম অধিকার
বলে, এতোদিন ধর্মের নামে অন্ধের মতো
আঁকড়ে রেখেছি যে নিয়ম, তাকে ক্ষতবিক্ষত
করে সে চলেছে স্বচ্ছতা নিয়ে জীবনের গতি
বাড়াবার দিকে। আমরা তখনো মানছি নিয়তি।

এখনো কাউকে সাপে কামড়ালে মনসার কাছে
পুজো দিয়ে, কেউ ভাসানে চড়িয়ে বলি—যদি বাঁচে
সে শুধুমাত্র দৈবকৃপায়; ললাট লিখন
কপালে থাকলে আসবে কখন অকাল মরণ।
ভক্তির কাছে যুক্তির এই পরাজয় মেনে
যে নেবে না, তাকে বলা যায়, তার রোগ আছে
ব্রেনে।

কতো সহজিয়া জীবন যাপন ছিলো একদিন!
বিজ্ঞান এসে ক্রমশই তাকে করেছে বিলীন।
ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির বীজ বুনে চলা তার
স্বভাবধর্ম। আমরা খুঁজছি কিভাবে যে পাবো
পরমাত্মার।
আশীর্বচন। ছুটছি তো আগে পেছনের দিকে;
আমরা ভাবছি, জ্যোতিষার্ণব কি রেখেছে লিখে?
যদি মুছে দাও জীবন থেকেই গতি ও প্রগতি
তুমি হবে এক জড়দগর, এক মূঢ় মহামতি।

দুটি কবিতা

শান্ত রায়

দুঃখী কুকুরেরা

সারাদিন দাবদাহ ভারি কষ্ট—

সন্ধ্যেবেলা দিঘিপাড়ে, ঘাসের জাজিমে
ঘুমিয়ে পড়েছে আহা, জন্মদুখী
পথকুকুরেরা

হাওয়া আসে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়...

পারে না নিঃশ্বাস নিতে

ভিতু ভিতু ছেলেটিকে বলেন শিক্ষক - 'ভূত
বনে নয়, থাকে
তোরই মনে!'
নিরীহ মানুষ জন পারে না নিঃশ্বাস নিতে
প্রাণ ভ'রে
উত্তেজনাময় 'নির্বাচন'-এ।

ভাসতে থাকুন

রথীন কর

কোন নদীতে ভাসতে চান
হিংলো? অজয়? ময়ুরাক্ষী?
ভাসতে থাকুন ভাসতে শিখুন
ঘোলা জলে মাছ ধরুন
ভাসতে ভাসতে কান্দি
ভাসতে ভাসতে 'হরি-হরি'।
মন্ত্রী আসুক শাস্ত্রী আসুক
ও বি ভ্যান আর হাস্য মুখ।

প্রধান বাবুর লিস্টি
হবে বড় সাহেবের সহি
ততদিনে চন্দ্রবিন্দু,
ততদিনে 'বডি'।
ভয় কি তোমার ছেলে আছে
ছেলের গলায় কাছা
কাছার কাপড় কে দিয়েছে
হাতের কাছে শিল্প বন্ধু
নয়তো আছে বাস্তুবন্ধু

ভাঙা সাঁকোর তলা দিয়ে
মিথ্যে কথার শূন্য ভেলায়
ভাসতে থাকুন
ভাসতে ভাসতে বাঁচতে শিখুন
বাঁচতে বাঁচতে ভাসতে চলুন।

বঙ্গসুধাধারা

ধ্রুব বসু

নদী এখানে ভেনাসের মতো সুন্দর
সুন্দর সুন্দরতম।
তার মুখাবয়বে দ্যোতিত
ভেসে যাওয়া গুল্মের গান—
ঈশ্বর পাটনির নাওয়ে চড়ে
পরমানন্দময়ী চলেছেন
ভক্তগৃহ অভিমুখে।
এ চিরায়ত লাবণ্য আহা
আমি করি পান
প্রণমিত নদীঘাটে বসে,
বুকের ভিতর আলোকিত মন্দির
বাতাস আসে, কানে কানে বলে যায়—
'**বিশ্বায়ন** মিথ্যুক, **মিথ্যুক**।'

আমৃত্যু

জীবনময় দত্ত

জং ধরা চাবি হাতে
বারে বারে অতীতের দরজা খুলে কি লাভ?
হয়তো বিপুল এক ঐশ্বর্য ছিল
আছে এক বয়স্ক ইতিহাস
ভাড়াটে উর্দিতে সম্রাট সাজায়
বদলে যাবে কি বর্তমান!

অবহেলিত কৃষ্ণচূড়ার সমারোহে বসন্ত
বড় নিরক্ত মনে হয়। কিশোরী এক সময় যুবতী হয়—
ভালোবাসা? অতি ব্যবহারে অর্থহীন লাগে
চারপাশে সারি সারি কপট মানুষরা
আমৃত্যু এভাবেই বেঁচে থাকার প্রহসন করে যায়।

লক্ষ্যভ্রষ্ট অস্ত্রের জন্য

দেবকুমার দত্ত

পৃথিবীতে ক্ষেপনাস্ত্র যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হতো
বজ্রমুঠি যদি সঠিক জায়গায় আছড়ে পড়তো
প্রতিটি মাইন
প্রতিটি উদ্ধত মেশিনগান
যদি লক্ষভেদে সর্বদাই রক্তাক্ত সাফল্য পেত
তাহলে এখনও হয়তো দাবানলে মরতো না জের
বাইরে দূরে নিকটে বা দিকচক্রবালে!

লক্ষ্যভেদ করা অপেক্ষা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া জরুরি এখন
মৃত্যুর খতিয়ান
ধর্ষণ দাঙ্গা লুটতরাজ আত্মঘাতী বিস্ফোরণ
এ সবের শেষে যতিচিহ্ন আবশ্যক সর্বক্ষণ।

ভীষণ আবশ্যক এখন
লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরগুলি বোমা ক্ষেপনাস্ত্র অগণন।

এ সব দেখে ধনুর্ধরের হাসি পাবে —এ তো স্বাভাবিক।
চাই আমরা মাছের চোখটাকেও আস্ত সুরক্ষিত!
আজ এ সবের প্রয়োজন বিতর্ক বিড়ম্বিত।
দূর্বাঘাস শিশিরের নম্র সহবাসে
ভবিষ্যৎ উঠুক ফুটে
যে ভাবে চাঁদেরও অশ্রু ঝরে সুদূর প্রবাসে!

গুপ্ত চাঁদ

সর্বেশ্বর জানা

(কলকাতার কেয়াতলায় আমার এক বন্ধুর বাড়িতে এক সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম
হঠাৎ লোডশেডিং...)

আমি তোমাকে দেখতে গিয়ে চাঁদ দেখে এলাম
এই ধরিত্রীতে এই কলকাতার বুকে
আজ অনন্ত কাল পরে চাঁদ দেখলাম
তুমি তখন তোমার ঘরে নেই
জানলাম চার তলার ছাদে আছ
হঠাৎ কলকাতা অন্ধকারে নিমজ্জিত হল
শুধু ফুলকি কয়েকটি ভেসে উঠল
জানিয়ে দিল তারাই শুধু বেঁচে
সিঁড়ির হাতল ধরে গুটি গুটি পা পা
সরীসৃপের মতো ছাদে গেলাম তোমাকে দেখতে

তুমি কোথায়?
এ যে আলোর বন্যা
কোথা হতে এল পুরো এক থালা চাঁদ?
প্রতিবিম্বিত দেহে মনে আত্মায়
গগনব্যাপী সর্বত্র সর্বব্যাপী
কত দিন কত রাত কত যুগ ধরে
কলকাতার পথে পথে অলিতে গলিতে
ঘুরেছি অজান্তে খুঁজেছি
একবার মনেও হয়নি
চাঁদ নামে কিছু আছে বা ছিল
কিন্তু আজ?
এই জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে তুমি কে?
তুমি ভূত তুমি ভূতো তুমি কৃষ্ণ নিরাকার শূন্য ব্রহ্ম
তুমি নিশ্চিহ্ন স্বচ্ছ অন্ধ নির্বাক নিষ্পন্দ দ্বন্দহীন অন্য কেউ
আলো সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব অসামান্য অজ্ঞাত
অযাচিত অশনিসঙ্কিত অনিন্দিত অপূর্ব
সারা ছাদ অনাবৃত রুক্ষ অনাদৃত অচুম্বিত অর্থহীন
বৃথা গগনভেদী হর্ম্যশ্রেণী

বৃথা তমসাবৃত বা সূর্যালোকিত কলকাতা
বৃথা ধ্বনি প্রতিধ্বনি স্তব্ধতা নিস্তব্ধতা
সভ্যতা মান অভিমান
আশা জীবন মৃত্যু অহংকার প্রগতি অবনতি

আজ শুধু প্রাণ খুলে চিৎকার করে হাসতে চাই
আজ শুধু আমি ও চাঁদের আলোর জোয়ার
অভাবিত ঐতিহ্যের মুগ্ধ আচরণ
আনন্দ প্রবাহে জীবনের স্পন্দন
সৃষ্টির আদিকথা ব্যথা ইতিকথা

আজ আমি বদ্ধপরিকর চাঁদের উপর ভর করে
মাধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য করে
একমুষ্টি ধূলি নিয়ে পৃথিবীকে অবাক করে
চাঁদ দেখে বিজয়ানন্দে ফিরে যাব
কিন্তু, যদিচ, কলকাতা মৃত অন্ধকূপ
তবু চাঁদখানি দেখ
কলকাতারই বুকে ছাদখানি দেখ
দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত বিকীর্ণ অখিল
এ..... সে আর এক দেশ আরেক মহাদেশ
তারা আমাদের অগ্রাহ্য করে
আপন মনে উচ্ছাসে উদ্বেলিত হচ্ছিল
আপনি মেতে চলেছিল
আর তুমি আপনমনে নিঃশব্দে নির্জনে
চাঁদের সঙ্গে প্রমোদ আলাপে ব্যস্ত
আমি দুঃখিত তোমাকে বিরক্ত করলাম
তোমার নিবিষ্ট মিলনে বাধা দিলাম
কিন্তু আজ যদি কলকাতা অন্ধকার না হতো
তুমি যদি ছাদে না ই যেতে
আমি যদি তোমার খোঁজে না যেতাম
চাঁদের সন্ধান ই পেতাম না
হয়তো একদিন চাঁদ না দেখেই মরে যেতে হত

ধন্য তুমি কী সুন্দর কলকাতা
চাঁদে কলকাতায় কী মাখামাখি

তোমার ভোর-করা ডাকটা

সত্য গুহ

তুমি ডাক দিয়েছিলে
ভোর-করা পাখির ডাক ভেবে
পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছিলাম

ভোরের পাতলা ঘুম
এ সময়েই পাখিদের নীড় ছাড়ার হিড়িক
আর স্বপ্নরাও কিয়দ্দুর অব্দি তাদের সঙ্গী

আমার অভ্যন্তরের প্রেক্ষাগৃহে
অন্ধকারের আলোয় চলচ্চিত্র জমজমাট
আমার বিপরীতে মুখ্য নারীচরিত্র তুমি

প্রেম ও মরীচিকা দিয়ে গড়া
তুমি পথ দিয়ে আমায় ডেকে ডেকে চলে যাচ্ছ
আমি শুকনো তৃষ্ণা তোমার অনুসারী

শৃঙ্গার মুহূর্তে সকাল হয়ে যায়
চোখ কচলাই দেখি শ্রীচরণেষু বোলের
মর্মরমূর্তি যেন হরিদা, বেড-টি নিয়ে দাঁড়িয়ে চৌকাঠে

ভোর-করা তোমার ডাকটা এখনো প্রাণে লেগে...!

কেন মেয়ে

চন্দনা মণ্ডল

কেন তুই মেয়ে হয়েছিস
কেন আশায় ডানা মেলেছিস
জন্ম তোর মেয়ে জন্ম
হবে না তোর দ্বারা কর্ম
মেয়ে মানে বিয়ে হবে
তারপর তুই মা!
তোর কাজ জন্ম দেওয়া
সন্তানের দায়িত্ব নেওয়া
তোর জন্য নয়
জীবন ভাবনা!
তোর জন্ম শুধুই দেবার
তুই পাবি না কোনো অধিকার
নেবে সবাই রক্ত চুষে
রক্ত চোষার দল
এই তোর জন্ম ফল।

মেঘলা দিন

চৌধুরী নাজির হোসেন

জানালার নীল কাচে গুঁড়ি বৃষ্টি
খুলে দেখি ঝড়ো হাওয়ায়
আশাহত ধুলোকণা বসে আছে।

মনের ভিতর মেঘ ডাকে,
বৃষ্টি জমে জমে শিলাকুচি
সেই গত কাল থেকে আজও...

আকাশের মুখ ভীষণ গুমোট,
বাইরে ফসলের ফাটা মাঠ
ভাঙা ভাঙা জ্যামিতিক কোণ যেন!

দূরে, মাটির অনেক দূরে
সতৃষ্ণ চাতক ডানা ঝাপটায়
বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দাও...

অবিন্যস্ত

নূর মহম্মদ

অবিনাশী জীবনের দিকে ছুটতে গিয়ে
আমার ঘরের ভিতর হয়ে ওঠে অগোছালো
সাজাতে ভুলে যাই পরিপাটি গৃহস্থের মতো
সবকিছু পড়ে থাকে এলোমেলো একাকার বিস্তীর্ণ
শব্দময় অলৌকিক যানে চেপে কখন হৃদয় আমার
হিসাবের সকল নিয়ম ফেলে যায় দূরে সরে
অন্যজীবন ছুঁতে ছুঁতে হয়ে যাই পূর্ণ সত্যবান
প্রতিনিয়ত নষ্ট হয় আমার পার্থিব যাপন।

পঞ্চমা

শম্পা বণিক

অসহায়

পরিকল্পিত প্রত্যাখ্যানে
কৈফিয়ত—
কেবলই করুণ প্রহসন।

ভালোবাসা

বিশ্বাসহীন স্বপ্নেরা
উড়ান ভরে তবু
রক্তাক্ত আনন্দে।
আর অমরতা সেখানেই।

মুক্তি

আজ বড়ো শীতলতা অনুভবে
ছাইগুলো মিলিয়েছি স্রোতে
যদি হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে
ছড়ায় উত্তাপ।

মুখোশ

সময়টা বুঝি ছুটছে আরও জোরে
স্বঘোষিত ব্যস্ততায়।

অনুরোধ

নদী হতে পারেনি সে স্রোত,
তাই বলে তাকে নর্দমা বানিয়ো না।

সাঁঝ বেলা

নন্দিতা মিত্র

এই বর্ষণ মুখরিত, সাঁঝবেলাতে
চলনা দুজনে স্বর্গ গড়ি
যদি যায় ভেসে যাক পৃথিবী
বেয়ে চলি দুজনার স্বপ্নতরী
ঘন বরষায় ছেয়ে আছে আকাশ
তাই ফুটছে না আজ আর চাঁদের হাসি
ভাবো, না দেখা জ্যোৎস্না আর মেঘেতে
কি দারুণ ভালোবাসাবাসি।
জানো, মেঘ ভেঙে যেই ফোটে চাঁদের হাসি
মনে পড়ে যায় ওই রূপের ডালি
যেন না ফোটা কুমুদ আর সরোবরে
খেলছে শরমে খেলাখেলি।

শব্দের রঙ

শ্যামসুন্দর গুঁই

শব্দের মত খানখান হয়ে ভাঙছে এখন মানুষ
অন্ধকারে নিশীথ রাতে অলীক আলোর ফানুস
মোহিত হয়ে উৎসবে মজে মানুষ দিগভ্রান্ত
দ্বিপ্রহরে বিবর্ণ রোদ নিষ্প্রভ বড় শ্রান্ত

শব্দ মানে শুধু কোলাহল শব্দ আগ্নেয়াস্ত্র
বিভীষিকার উৎসমুখে বিপর্যস্ত গার্হস্থ
উদ্বেগ উৎকণ্ঠাঘন কুসুম কন্টকাকীর্ণ
অহঙ্কারী বঙ্গচেতন মরানদী প্রায় শীর্ণ

তবু রণণ ওঠে সুরঝঙ্কারে শব্দ-সমস্বরে
ঐক্যতানের দামামা পিঠে রাজপথে যায় বয়ে
শব্দ মিছিল প্রলম্বিত জ্বলে সূর্যের রঙ
নিঃশঙ্ক নিষ্কম্প নেই কোনো তার ঢং।

কার্নিশ

অলক জানা

রোদ ঝড় বৃষ্টির নিত্যদিন
অত্যাচারে জরাজীর্ণ আমি;
বুকে আগাছার জঙ্গল,
সময়ের সাথে ঝরা পলেস্তরায়
ঠিকরে বেরোয় লোহার পাঁজর।
একদিন আমারও ছিল
রঙের জমক; উজ্জ্বল নীল সাদা,
আজ বিছুটি আর ফার্নের সখ্যতা।
একদিন টুনির আলোয়
জেগেছি ঝলমলে দীপাবলি রাত।
ধূসর শ্যাওলা বুকে কাকের পটি
আর উপরের জানালা থেকে
ফেলা পিক; আজ বেঁচে অনাদরে।
তবু কর্তব্য থেকে হইনি বিচ্যুত
এখনও বৃষ্টির তীরক্ষেপ থেকে
রক্ষা করি তোমার আশ্রয়।
তবু অবহেলা বঞ্চনায় কখনো
সিমেন্ট বালি মাংস পেশিতে
জাগে যদি বিদ্রোহ অনল;
খসে পড়ি তোমার মাথায়,
দোষ যেন দিও না আমায়।

সমর্পিত

দয়াময় পোদ্দার

জোছনার ভিতর দিয়ে চাঁদ, অনিন্দ্য হেঁটে গেছে
সারারাত ঝাউবনে হাওয়ার প্রলেপ কুয়াশা
শাড়ির আঁচল টেনে হাল্কা শীত, উষ্ণতা খুঁজেছে হাঁসপাখি।
তাকে আদরে-চুম্বনে সেতার বেজেছে আহির ভৈরবীতে
চোখের কোণায় বিন্দু - জল অনুযোগ আর অভিযোগে টলমল
ক্লান্তিহীন দিনাতিপাত-বোধের অতীত ভাষ্যে
তাকে বাঁধা যায় না, আর
হেঁটে যাবার পর চাঁদ ঘুমিয়ে যায়, যে পায়ের ছাপ
এখনও জেগে রয়েছে—আমার সমর্পিত মুগ্ধতা।

স্মৃতি

শিল্পী গঙ্গোপাধ্যায়

না হয় তোমার একটু স্মৃতি থাকল পড়ে আমার ঘরে
মায়ের বিয়ের বেনারসির মত, হয়তো মলিন, হয়তো ছেঁড়া
কিন্তু ভারী যত্নে রাখা, সময় পেলে
হাত বুলিয়ে স্মৃতির ঘ্রাণটা বুকে নেওয়া।

ভাতের গন্ধ

সুজান মিঠি

ঝরঝরিয়ে স্বপ্ন ঝরে নোনায় দিনরাত,
রঙিন মনে কান্না ভাতে শহর ফুটপাত।

দিনের শুরু খুঁজতে থাকা অন্য রবির খোঁজ,
রাতের বুকে ডাস্টবিনে পায় বিনে পয়সার ভোজ।

ঝরঝরিয়ে স্বপ্নগুলো চোখে তবু ভাসে,
ভাতের গন্ধ মাখবে গায়ে কোন সে পৌষ মাসে।

কবিতা

সূর্যস্বপন ঘোষ

একদিন একরাত থাকব তোমার সাথে
তোমরা গ্রামে কবিতার কাছারিতে,
ভাষার জন্ম হবে ভাবের আঁতুড় ঘরে।

তোমার গ্রামে
জোছনার চাদর বিছানো ঘাসে,
মাটির মধুর শীতল স্পর্শে
ভাবে ভাষায় মিলে মিশে
কবিতার কাছারিতে থাকবো
তোমরা সাথে একদিন একরাত।

চিরুনি ছায়ার মতো বাঁশপাতা চিরে
ভোরের সূর্য এসে আমার শরীরে
এঁকে দেবে পৃথিবীর রং।

দিনান্তে চরের ক্লান্তি দিঘির জল ছুঁয়ে
মুছে দেবে খয়েরি সূর্য।
তোমার জন্ম হবে ভাবের আঁতুড় ঘরে।

কবিতা তোমার গ্রামে তোমার সাথে
একদিন একরাত।

অমরত্বের খোঁজে

অমিত পাল

মৃত্যু বড় যে ভয়ংকর
মৃত্যুকে আজ কোরো না ভয়,
মৃত্যুর সাথে কোরো লড়াই
মৃত্যুকে কাল করবে জয়।

হতে পারি না

চন্দন মিত্র

হতে পারি না উচ্ছল
ভেতরে বাইরে ফুলে ঝরে রক্ত
অবৃষ্টির দেশে
গাইতে গেলে গলা কেঁপে যায়

কে যেন আর্তবাক্য ছুঁড়ে দেয়...
এই তোর মানুষ হওয়া
এই তোর ভুলে থাকা জন্ম পরিচয়
তুই না একদিন বৃষ্টি হবি
বলেছিলি শস্য হবি
হতে পারি না উচ্ছল তাই...

হৃদয়ে মননে

সঞ্জয়কুমার ঘোষ

জীবনে কিছু মুহূর্ত স্মৃতিতে থেকে যায়,
হৃদয়ের কোনে প্রলেপ মাখায়,
জানি সব ইচ্ছে সম্ভব নয়...
তবু স্মৃতি স্মরণীয় এই মনিকোঠায়,
মন ডাকে আমায় একটু সাড়া দিতে।
জানি অন্তরে মননে হৃদস্পন্দনে...
আছো তুমি আছো—
আমার হৃদয়ে মননে আত্মায় নিঃশ্বাসে।
তবু একবার ডাক দিয়ো,
সময়ের অবকাশে...
মন ভিজবে বৃষ্টির বারিধারাতে।
আমি পাথর হতে রাজি,
শুধু একটু বৃষ্টির জল পাই যেন।

খোঁজ নাও ঈশ্বর

পুলক মণ্ডল

কোন এক সূর্যডোবা রক্তিম মুহূর্তে তুমি এলে
যেন সাগর মন্থনে উঠে আসা একবিন্দু মুক্তোর মতো
মুক্তো! নাকি তোমার আঁখিপল্লব বেয়ে নামা
এক টুকরো মায়াবি জলবিন্দু।
বলো বলো কতটা গরল পান করলে এমন মায়ামুক্তো দেখা যায়?
কারা যেন অমৃত লাভের জন্য গরল পান করেছিল?
তারা কি জানে অমৃতহীন গরল পানের সুখ!
যারা সূর্যডোবা সাগরবেলায় দেখেছে তোমায়
শুধু তারাই জানে অন্তহীন এ সুখের ঠিকানা
হে ঈশ্বর, রাখো রাখো তোমার অহঙ্কার!
তুমি তো নীলকণ্ঠ হয়েছিলে, বিনিময়ে অমৃতও পেয়েছিলে
কিন্তু যারা শুধুই গরল পান করে একটুকরো ভালোবাসার জন্য...
খোঁজ রাখো তাদের ঈশ্বর!

আমি বাদ পড়ে গেছি

সুনির্মল কুণ্ডু

যে যার নিজের মুখ ধুয়ে নিচ্ছে... চোখে দিচ্ছে জল,
কথা যা হবার হচ্ছে—জটলায় রমরমা ভিড়,
আমি বাদ পড়ে গেছি—আমি এই ব্যস্ত পৃথিবীর
দেখলাম রোদ-ছায়া...অবিশ্রান্ত শ্রাবণের ঢল;
দেখলাম ফাঁকে ফাঁকে সূর্য দ্যাখা দিয়ে পলাতক—
প্রচুর সবুজ পাতা ঝলমলে গাছের শাখায়,
মানুষ বা কম কিসে? মানুষও বৃষ্টি মাখে গায়—
খসছে বাতাসে উড়ে সদ্য ভেজা পাখির পালক।

এসবের অন্তরালে সুখ দুঃখ থেকে যায় স্থির,
উদাস স্বপ্নের রাত একগুচ্ছ কর্মময় দিন
থেকে যায় পাশাপাশি—মানুষের দু-চোখে রঙীন
যে-পৃথিবী গড়ে ওঠে তার ক্ষত যথেষ্ট গভীর!
যে যার ইচ্ছের চালে ভেঙে দিচ্ছে সমস্ত নিয়ম—
আমার যা ইচ্ছে এই নিয়মেই হয়েছে খতম।

মায়ের কথা
বিশ্বনাথ দাস

হরিষ বলতো—
কবে সেই মুখাগ্নি করেছি,
তবুও মায়ের সঙ্গে দেখা হয় প্রত্যহ,
তুলসী তলায়, সাঁঝবাতির আলো
মা যেন দাঁড়িয়ে আছে আজও
মা আমায় শক্তি জোগায় আজও

আমার মা—
আমার মা আজও
শীর্ণহাতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়
ফুলচন্দন দিয়ে প্রার্থনা জানায়
ক্ষীণ দৃষ্টি মায়ের স্পর্শে আমি জেগে উঠি।
তবু কেন আমি ভুলে যাই মা তোমায়
ভাবলে আমার চোখের পাতা ভিজে যায়।

কাহিনী
সপ্তর্ষি বনিক

হ্যাঁ, ধর্ষিতার ছেলে আমি
কারো পাপের ফল
সবাই বলে আমি নাকি, কলঙ্ক
তাহলে সে ছেলেটি
যে বড়লোক মেয়ের বিয়ের আগেই পেটে এসেছে
কোনো এক বড়লোক ছেলের জন্য
কিন্তু টাকায় ঢেকে গেছে সে কলঙ্ক
সে ছেলে আজ সেন্টপলস্ এ পড়ে
আর আমার ভাগ্যে ভাতও জোটে না।

কুকুর আঁকেনি ছবি
অসীম মালিক

মানুষের আঁকা কুকুরের ছবি
যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে
উঠোনের রোদ্দুরে চেন দিয়ে বাঁধা
একটি কুকুর...
সামনে ছড়ান কুয়াশার মত সাদা ভাত
নিজস্ব রং তুলিতে
কুকুরের লেজটি আঁকতে সমর্থ হলেও
কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারিনি
কুকুরের লেজ নাড়া।
হয়ত এটা কুকুরের লেজ নয়
কুকুরের অন্তর্দৃষ্টি...
যা আমি খালি চোখে
ফুটিয়ে তুলতে পারছি না।

ছবিটা কোনও কুকুর আঁকলে
হয়ত মানুষ ও কুকুর
এক সারিতে এসে দাঁড়াত
কুকুরের সামনে ভাত ছড়িয়ে দিত
আরও একদল কুকুর...
সৌভাগ্য, মানুষ ছবিটা এঁকেছে
কুকুর আঁকেনি।

বাবা

রাশেদ মোশাররফ

চিটচিটে গরমে সারা মাঠ করে খাঁ খাঁ
শ্রান্তির ঝিরঝির বাতাস লাগে গায় বটবৃক্ষতলে
স্বপ্নধরার বিরান চরে ঘাম ঝরিয়ে
অবসন্নতায় বাবা এসে জিরায় বটের ছায়ায়;
মধ্যাহ্নে ডাল-ভাত খেয়ে আবারও ছুটে
হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে ক্ষেতে-খামারে।

পথ ঘাট বন্দর কারখানা ওয়ার্কশপে
আরো কত রকম পেশার বেসাতি বাবার
সেও তো বাবা কোনো পরিবারে ধরে হাল,
মরাগাঙে ঢেউ জাগানো উদ্যমী মাঝি
ধিক-ধিক বুকে তার কত সব স্বপ্ন করে খেলা
কেইবা বুঝে তার কষ্টের দিন গোনা।

বাবা আসে ফিরে সাঁঝবেলাতে
মুখের মৃদু হাসির ঝলক লাগে আঙিনায়—
সোনামণিরা কোথায়? দেখ, কি এনেছি।'
উদ্বেলিত সবাই বিস্ময়ে দেখে
'কি মজা! বাবা এসেছে।'
মাথার ওপর বাবার হাতের স্পর্শ
শান্তির ঠিকানা তিনি বটের ছায়া।

জন্মক্রম

আশরাফুল মণ্ডল...

ধাড়ি জমির শীৎকারে মাঠ কম্পমান
উপোসী লাঙ্গলের ফলা যেন বুনোমোষ
জমির গতরে বতরের আল্পনা দৃশ্যমান
ককিয়ে ওঠে জমি লাঙ্গলের চুয়াড় উল্লাসে
কালঘাম আর ভাঙাস্রাবে জমি থইথই
চষাভুঁই কাদা কাদা সুখে চোখ বুজে আবেশে।

শেষ থেকে শুরু

নিত্যানন্দ দাস

কে আপন কে পর
সবখানে শুধু ঝড়—
আত্মীয় স্বজন আর পরিজন
এদের নিয়েই তো জীবন।
আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু ভয়
সুখ সব কিছু নয়,
লড়াই করেই তো বাঁচা
অধিকারের প্রতিষ্ঠায়।
সকাল থেকে রাত
সপ্তাহ মাস বছর
কতো মুহূর্ত চলে যায়
বিবর্ণ লৌকিকতায়।
ভালো মন্দের খতিয়ান
সৃষ্টি, জীবন পাতায়—
নতুন কাহিনীর আলোকপাত
শেষ থেকে শুরু এভাবে।

ফিরে যাই আমার দেশে

বিমল মণ্ডল

নিজেকে খুঁজি স্মৃতির দর্পণে
সেই চেনা গ্রাম, তুলসীতলা আর
ঘোমটাপরা মায়ের পায়ের ছাপ রাখা উঠান
এসব ছুঁয়ে যায় নিভৃত পাখিজীবনে

সবুজ রং চোখে পড়ে না এখানে
কলকারখানার ধোঁয়া আর গাড়ির শব্দ
জীবনপথে অন্ধকার ঢেকে দেয়
এসব ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণতা আসে
নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

সবুজ ঘেরা গ্রাম
দুরন্ত হাওয়া
কাদামাখা রাস্তা
মায়ের আলতো ডাক
আমায় নিয়ে যায় আমার দেশে।

আরও চাই

সুজয় মজুমদার

সূর্য ডুবে গেছে;
আঁধারের দল দখল করেছে আকাশ,
দখল নিচ্ছে যে যার এলাকা
আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে বাতাস।
আমার দখলের অধিকারটুকু নিয়ে—
হেঁটে চলেছি আমি রাস্তায়
সবার মত একটাই বাসনা
আরও চাই—আরও চাই।

আহাম্মকি

সুদীপ্ত বিশ্বাস

মগজে তালাচাবি দিয়ে
বুকের সব লাল গোলাপগুচ্ছ
বাগান উজাড় করে তোমায় দিলাম।

কানাকড়ির চেয়েও কম দামে
বিকিয়ে দিলাম নিজেকে।

সব বাঁ পায়ে মাড়িয়ে মশমশিয়ে চলে গেলে।

বুকের গভীরে বিঁধে থাকা পেরেক
উপড়ে ফেলতে না পেরে,
নির্জন সমাধিতে আজও একা শুয়ে।

আজকাল কেউ স্ফটিক চাইতে এলে
তাকে কাঁচের টুকরোও দিতে পারি না
না।

কবিতা আমার, অশ্বমেধের ঘোড়া
সুনির্মল বসু

কবিতা আমার অশ্বমেধের ঘোড়া,
খোলা আকাশ হোক তার নিশ্চিত ঠিকানা,
আমার পক্ষিরাজ দেশে দেশে যাক, আমার
বুকের কান্না ভেজা কথাগুলো দিগন্তে ছড়াক।
সাফল্য মুখ দেখে না আমার, আমিও তাকে
দেখি না কখনো, এই দুঃখের দিনে কবিতা ছাড়া,
আশ্রয় কে আর আমার।
কবিতায় সাগরের নীল জল দেখি আমি,
ভেসে আসে অজানা নগর, জনপদ, মানুষের
অনাবিল হাসি, কবিতা, তোকে আমি বড়ই
ভালোবাসি।
জারুল, ঝাউ, পাইনের বনে আমার কবিতা হাঁটে
আমি পথ হারাই, হাজার জনতার মাঝে, হয়তো
মানুষ মনে রাখে না তাকে, তবু গাছে গাছে ফুল
ফোটে, আকাশ ওঠে জেগে।
অজানা শহরের এক কোণে, হাতল ভাঙ্গা চেয়ার,
পুরনো টেবিল কথা বলে,
কবিতা আমার, অশ্বমেধের ঘোড়া, আমি চলে
যাবার পর, হয়তো, কারো কারো ভালোবাসায়
পাবে, আলোর ঠিকানা।

জীবনের গোধূলি
সুদীপা সাহা

জীবনে গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে
পশ্চিম দূরে নয়—
ভাবি সেই কথা, মনের মধ্যে
কখনো বা জাগে ভয়।
এই যে প্রকৃতি—পৃথিবীর খেলা
কখনো মেঘ বা রোদ—
যত কিছু দেনা—যা ছিল যেখানে
করেছি কি পরিশোধ!
ফুল ফুটিয়েছি কখনো মাটিতে?
শিশুকে বেসেছি ভাল?
আজকে সে—কথা ভাবতে শেখায়
শেষ—গোধূলির আলো!

অনুচ্চার
রথীন পার্থ মণ্ডল

চাঁদের গুঁড়ো ঝরে ভিজিয়ে দিচ্ছে
আমার চোখ, ঠোঁট, বুক, নাভি...
ক্রমে ক্রমে পায়ের নখ ছুঁয়ে...
তুই যখন কথা বলিস
গা বেয়ে ওঠে সুখ।
একদিন লুটপাট করবি আমায়?
খারাপ ভাবলি?
আমি নষ্ট মেয়ে নই
শরীরেও সাড়া পাই না তেমন।
কতগুলো বছর তো খরচ করে দিলাম
স্বামী নামক পরপুরুষের ঘর করে;
একবার অন্তত দেখি
মরণের গায়ে কতখানি ওম!

একটি মানুষ

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

একটি মানুষ ধম্মো করে। কম্মো করে খায়
অন্য মানুষ। হাজার মানুষ তার পিছনেই ধায়।
একটি মানুষ অস্ত্র হাতে, অন্য মানুষ তার
সামনে এসে হাজার মুখে জানাচ্ছে ধিক্কার।

একটি মানুষ মন্দিরময়। হাজার মানুষ মাঠ।
একটি মানুষ নিখোঁজ হলেও সমগ্র তল্লাট
মানুষ এবং মানুষ শুধু। পাঁজর-ভরা জল...
ঘোড়ার পায়ে নূপুর, উদাস রাজার আস্তাবল।

একটি মানুষ রক্তপায়ী। বাদবাকি সব জীব।
তার কাছে যা পাথর, বাকি সবার কাছেই শিব।
চিতার থাবায় লুণ্ঠিত হয় হাজার গোলাপ ফুল;
গন্ধ তবু যায় যে ভেসে সাগর-উপকূল।

একটি মানুষ ভাগ করে যায় মন্দির-মসজিদ।
লক্ষ মানুষ এক করে নেয় এক্সমাস আর ইদ।
একটি মানুষ অঙ্ক কষে, যোগ-বিয়োগে ভুল!
মানচিত্র তেমনি থাকে, নড়েনি একচুল।

একটি মানুষ বড্ড বোকা, মজ্জা কুরে খায়।
হাজার মানুষ লজ্জাটুকু বিবেকে আটকায়।
হাজার মানুষ মাটি খুঁড়ে বানাচ্ছে উদ্ভিদ।
একটি মানুষ তাই না দেখে যাচ্ছে কেটে সিঁদ।

মানুষ শুধুই মানুষ নাকি! দুই পাঅলা প্রাণ।
এক মানুষে আগুন জ্বালায়। হাজার মানুষ গান
করতে থাকে পৃথিবীময়। মানুষ মানেই সব।
ভোরের পাখির কূজনমুখর জীবনে উদ্ভব।

বিবর্তনের পরে

শচীন দত্ত

তোমায় আমি তখন থেকে চিনি
পৃথিবীটা জন্ম নিল যখন
মহাবিশ্বে কোন্ অতীতে জানি
ঘটেছিল প্রবল বিস্ফোরণ।

মাটি তখন ছিল তপ্ত তরল
বস্তুরা সব বাষ্প হয়ে ভেসে
আকাশ জুড়ে ঘন মেঘের মতো
পৃথিবীকে রেখেছিল ঠেসে।

জলের সৃষ্টির আরো অনেক পরে—
গাছগাছালি জন্ম দিল ভূমি
জীব কোষের সৃষ্টি যখন হল
তার ভেতরে লুকিয়ে ছিলে তুমি।

কতো লক্ষ বছর আগের কথা—
আমরা দুজন কোথা থেকে আসি
অ্যামিবা-তে প্রাণী হয়ে থেকে
ভেসে গেছি জলেই পাশাপাশি।

তারপরে যে মানুষ হলাম কবে—
হাজার হাজার বিবর্তনের ফলে
কতো জীবন যাপন করে শেষে
কতো জন্ম পেরিয়ে এলাম চলে।

সে সব কথা ভেবে কী লাভ বলো
এ জন্মই কী ভালো করে চিনি?
তোমার কথাই ভাবি সর্ব কাজে
জীবনটাই যে বাজার, বিকিকিনি।

ভুলেই যাবে দিন ফুরালে জানি
আমার কথা, থাকবে মনে ভারী
জীবন যখন শেষের খেয়া বেয়ে
তোমায় আমায় করবে ছাড়াছাড়ি।

নট্

আশিস সাঁফুই

চাইলেই আমিও কলঙ্কভাগী হই
রং আর পুতুলের কথকতা নিয়ে উত্থাপিত হই
চাইলেই খসে পড়ে উত্তেজনা ধূসর বসন
তুমি, চাইলেই মরণ অবাধ, জীবিত নড়ন-চড়ন

ওপারে মুখ ফেরালে মানুষ, দর্শকাসন
এপারে ফেরালে মুখ মানুষ, অশ্রু, আবেগী মন
উন্মত্ত প্রেমিক থেকে কৃষকের লাঙল কাঁধ
কখনো গাছ হয়ে বাঁচা কখনো স্বেচ্ছাচার অবাধ

তালি কুড়োতে কুড়োতে পাষাণবৎ অভিনেতা
কৌশল কেরামতি চাপল্য, শিল্প, শিল্পী কে তা?
পাগড়ি খসে যাচ্ছে, দ্যাখো, সম্মান কুড়োতে
হাঃ সম্মান। কলঙ্কওঁ ঢোকে, কলঙ্কও জন্মায় গর্ভ-তে।

এপাশ ওপাশ দুলতে দুলতে পেন্ডুলাম
তুখোড় অভিনয়, দর্শক এপার ওপার দর্শক ডান-বাম
তালি তুড়ি সম্মান; রচনা-প্রেক্ষাপট
তুমি চাইলেই সং নাচ গান লাফাবে দৌড়াবে নট

তুমি চাইলেই গল্পরা আসে আমরা চরিত্র সাজি
নাচন কোঁদন বাধ্য অভিনয়, আমরা নট হতে রাজি!

এখন মানুষ

অলক শ্রীমানী

টুকটাক ছেনালী, করার চেয়ে—
পাইকারি রতিক্রিয়া কতো স্বাচ্ছন্দ্যের,
সঙ্গমলিপ্সু বেশরম ছেলেরা হাতড়ায়
ঘুঁটে কুড়ুনি মেয়ের বুনো বাকলের গন্ধ!

তুমি আসবে জেনেও

দীপকুমার

তুমি আসবে জেনেও
ঘর সাজাইনি আজ
ফেলে হে সব কাজ
মালা তো গাঁথিনি ওরে
ফুল ফুটে যে গেছে ঝরে
নয়ন পেল তাইতে কি রে
লজ্জাবতীর লাজ

তুমি আসবে জেনেও
পথের পরে পড়িনি লুটায়।
এ পথের ও ধূলায়
যাঁরা গেল দেখতে তোমায়
বাঁধলে তাঁদের তোমার চুমায়
পেলাম না ঠাঁই তোমার ক্ষমায়
ব্যর্থ হলো সাজ

তুমি আসবে জেনেও
আনন্দে হে হইনি আত্মহারা
হে হইনি পাগল পারা
বাদল দিনের মেঘের মত
চাতক পাখির চাওয়ার মত
দিক-বিদিকে অবিরত
আশা নিরাশার মাঝ

তোমার পৃথিবী আমাকে ছোঁবে না কোনোদিন অথচ বন্ধন থেকে যাবে

ত্রিস্তান আনন্দ

যাও তবে ব আকাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে বালিহাঁস উড়ে যাও
উড়ে যাও যা ও

এসো না ফিরে আর পাখনার প্রতীতি মুছে মিশে চলে যাও ফিরে যাও
গিটবাঁধা গেরুয়া আঁচলে গোপনে আঁটা ছিল রিটার্ন টিকিট
সাতরাজার ধন জেনে ভিখারি সেজেছি লোভে আহা
এই গাঙের দিন এই জলাশয়ের দিন এই হেমন্তের দিন
ফেলে যাও ভুলে যাও

মেঘমেদুর ধোঁয়ায় লুকানো পথে যূথবদ্ধ অক্ষর ভেঙে বর্ণমালায় ফিরে যাও চলে যাও
বাস্তুখেকো নদীজলে ডুবে ভেসে ডুবে ভেসে দূরবর্তী চরের আঙিনায়
রচেছি জীবনের অন্তিম নিবাস
একঝাঁক নিবিড় ডানা ছিনে নিয়ে গেল ভেজাবালুকার স্বপ্নমায়ামতিভ্রম
শিলমাছের পিঠে ডুবে গেল মহাকাব্যের সমস্ত বর্ণগ্রাম

শ্যাওলার বাসা নেই মৃদু স্রোতে ভাসা নেই
সুবর্ণদহ'র ভরাটবুকে উবু হয়ে শুয়ে আছে
পূর্বজন্মে সাঁতারু নৌকার ক্লান্ত পাটাতন

ধোঁয়ার অনুপল ছায়ায় মানচিত্র এঁকে গেলে ভুলে
যা ও ফেলে উড়ে ভুলে যা ও

বহুরূপী

প্রবীরকুমার ঘোষ

ফুল তারা পদ্ম—
সবারই রূপ ছদ্ম।
আসল রূপ কি, তা জানো?
এরা সবাই-ই একেকটা দানো।

নবজীবনের নাটক

দেবদত্ত ভট্টাচার্য

ছোটবেলা থেকেই নত হয়ে থাকার
দীক্ষাপ্রাপ্তি ঘটেছিলো তার,
নত হতে হতে একদিন শেষবেলায়
তার নত হওয়ার 'মেমারি' সম্পূর্ণ হয়ে গেলো।
'নো স্পেস' জানান দিয়ে সে
আরো ঋজু আরো দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।
চারপাশের কুশীলবেরা যখন যবনিকাপাতের অপেক্ষায়,
তখনই সে জলদগম্ভীর স্বরে জানান দিলো,
'এই নাটকের শেষদৃশ্য আপাতত
মঞ্চস্থ হচ্ছে না।'
শূন্য মঞ্চের দিকে দর্শকরা তখনো
বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে,
ক্ষণকাল পরে শোনা গেলো
বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠের উৎক্ষেপণ—
"ধর্মরাজ শুনুন....
উষ্ণ অভ্যর্থনায় নবজীবনের নতুন নাটক শুরু হয়ে গেলো।

কাকের কর্কশ রব শুনি

পল্লবকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিঃশব্দের মৃত্যুর কথা শুধু
হিমালয় মাথা তুললো বলেই
তার বোধের গভীরতা ছড়িয়ে সমুদ্রে
এও তো উচ্চতারই মাহাত্ম্য
ভীষণ সংকটে জয়ী পর্বত আরোহীর
বাঁশি ধ্বনি নীরবের পারাপারে
স্বপ্নের রাজকন্যা এ ভাবেই নামে নূপুরের শব্দে
নিঃশব্দের প্রতিধ্বনি শুনি যতবার!

বসন্তবার্তা

সোমনাথ মণ্ডল

কুহু কুহু মিষ্টি সুরে
ডাকছ কাকে তুমি?
বসন্ত তোমার তানে
ঘুমিয়ে আছে বুঝি।
জাগাও তবে তাকে
ছড়াও ফাগের বান
সে রঙেতে রাঙিয়ে নিই
এই নিঃস্ব বেলার গান।

ভাবনা

অপর্ণা ঘোষ

পড়ন্ত বিকেলে
সূর্যি ডোবার মুহূর্তে,
নিবিড় অনুভবে
তোমার আলিঙ্গনে,
রক্তিম আবেশে
বিস্মৃতির আড়ালে
স্মৃতির জাগরণে
শুধু তুমি...
ইচ্ছের আগল খুলে
নীরবতার মাঝে,
স্বপ্নের জোয়ারে
উষ্ণতার ডুবসাগরে,
ফেনিল সাগরে
ঢেউয়ের আলোড়নে।
বালিয়াড়ির পা ছুঁয়ে
শুধুই তুমি...

অমোচ্য অপমান

অমল কর

পড়ন্তবেলায় গোধূলির শেষ নির্যাস
নিংড়ে নেবে বলে খুব দ্রুততায় ডেকে নিলে...

হাট-খোলা দরজায় সসম্ভ্রমে সসঙ্কোচে
নিঃশব্দে ঢুকে গেল আমার তৃষিত মন
যেখানে পেতে দিলে আসন
কাঁচুমাচু প্রতীক্ষায়... বহুক্ষণ...

সৃজন-চিহ্নের মধ্যে ডুব দিলে...
অক্ষরমালার বৈভব নিয়ে
ঝড়ো-জীবনের বর্ণনায়...
তোমার হাতে অনুশাসন...
চোখে অশণি...
ভেতরে ভেতরে পুড়ে গেল দৈত্য...

শরীরের নীল চিহ্নের অজুহাতে
খুললে না শরীর
অধরা শৃঙ্গ জয়...
সিংহাসনে হল না বসা, আসনে উই
দমবন্ধ হাহাকার নিয়ে দরজা পেরিয়ে
বিস্রস্ত বিধ্বস্ত অমোচ্য অপমানে
দিনগুলো রাতগুলো বুড়ো তক্ষকের স্বরে
ককিয়ে কেঁদে ফেরে

চাঁদের কলার মতো ক্রমশ রসে বসে ওঠো বেড়ে
শিরোপায় কলঙ্ক মেখে হুতাশে থাকব হতাশের দলে...

বাঁধন

অর্ণব ভদ্র

তুই আমার ভোরের আলো
ঝিরি ঝিরি বাতাস
দিনে রাতে বুকের মাঝে
মৃদু মন্দ কাঁপাস
তুই আমার প্রাণের কৃষ্ণ
আবার আমার রাধা
সুখ দুঃখ যত আমার
তোর কাছে বাঁধা।।
তুই আমার শীতল ছায়া
দারুণ রোদের মাঝে
সন্ধ্যা বেলা মঙ্গল শাঁখ
তোর জন্য বাজে।।
তুই আমার চোখের জল
গাল বেয়ে নামিস
আবার কখন একলা হয়ে
বুকের ঘরে থাকিস।।
তুই আমার ছেলেবেলা
বৃষ্টি ভেজা দিন
নৌকা খানা দিলাম হাতে
ভাসুক অন্তহীন।।

না জেনে হারানোটাই ইচ্ছে

স্বপ্ননীল

ইচ্ছে হলেই
কেউ একদিন নদী হতে পারে,
চলে যেতে পারে যেখানে মন চায়।
অজানাও একদিন ঠিকানা হয়ে যায়।

ইচ্ছে হলে
কোনো একদিন আমার কাছেও আসতে পারো
যদিও আমার কোনো ঠিকানা নেই।
ঐ নদীপথের মতোই আমারও সব বাস্তুহারা
আমিও একদিন ইচ্ছের মতো হারানো দুকুল...
আর থৈ থৈ ঢেউ... বিপুল হারা...

হয়তো কয়েক পশলা বৃষ্টির মতো
একটা শ্রাবণ একদিন তোমারও মনের ভিতর...
তারপর একদিন
দুকুল হারা হয়তো বা কোনো এক নদী হয়ে গেল...
হয়ে গেলে আমারই মতো একদম সর্বহারা।

যোজ্যতা

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

পায়ে পায়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সাঁকো...
মন পড়ে আছে অনাবিষ্কৃত আঁতুড়ঘরে।
আকাশের মেঘ আরও ঘন হচ্ছে দিগন্তে
পূর্ণিমা রাত আজ অসহায় প্রকাশমালায়।
বসে থাকা অন্ধকারে; এমন মিলন- দিনে বুঝি
যোজ্যতা বেড়ে ওঠে কণায় কণায়।
বাড়ানো হাত ছুঁয়ে দিতে পারে গভীর আলোক।
এমন সময় শুধু জীবন্ত অগ্নি-শলাকায়
গেঁথে আছে অবাধ্য, ভীরু অন্তর-মিল।

আহ্বান

সুদীপ্ত বিশ্বাস

গুমরে মরেছি শুধু মনের গভীরে।
অস্ফুট আর্তিতে, অপেক্ষায়-অপেক্ষায়
বয়ে গেছে রক্তধারা এই যমুনায়।
রুধিরের স্রোত জল বৃথা, সব বৃথা।
অনেক মায়াবী রাত ঝলমলে দিন,
নিতান্ত নিস্ফল তারা, অপুষ্পক স্মৃতি।
এখনও গোলাপবাগে আধফোটা কুঁড়ি,
ভ্রমরের স্পর্শ পেতে প্রচণ্ড উন্মুখ। প্রতীক্ষা
প্রতীক্ষা নিয়ে রাত ভোর জেগে,
সরিয়ে রেখেছি পাশে বরমাল্য খানি।
তারার জন্মের পর তারার মৃত্যুতে
চুপচাপ কাল স্রোতে বয়ে গেছে কাল।
নিঝুম দুপুর থেকে ধূসর বিকেলে অলিন্দে একাকী
বসে দেখেছি জগত।
লুকিয়ে রেখেছি কত পক্ষ বিধুনন।
আগ্নেয়গিরির সেই উদ্‌গিরণের মত,
আজ আমি অভিসারী, রোমাঞ্চ পিয়াসী।
তুমি এসো...মুগ্ধতার সে প্রাচীন
অধিকার নিয়ে এসো, রুদ্ধদ্বারে
বার বার কর করাঘাত।
তোমার উদ্ধত ফণায় আমাকে বিদ্ধ কর,
মুগ্ধ কর, কর শিহরিত, বাজিয়ে তোমার বীণ;
নিয়ে চল জ্যোৎস্নার মায়াবী জগতে।
তোমার ডানার স্বেদ বিন্দু গড়িয়ে পড়ুক আমার ডানায়।
কানায় কানায় উপচে উঠুক রসস্রোত।
পিয়াসী তৃষ্ণার্ত বুকে ঢেলে দাও অমৃত তোমার...

আমার আমার

কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী

আমার আমার করে সারা
সারাদেশে মানুষেরা।
জাত নিয়ে আর অর্থ নিয়ে করে মারামারি
এই মানুষের কারবারি।
প্রাণ থাকে যতক্ষণ
আমার আমার ততক্ষণ।
বুজলে আঁখি
সবই ফাঁকি।

আস্তানা বদল
ইন্দিরা ব্যানার্জি

আমি ছিলাম এক বৃক্ষনারী;
একটু একটু করে চারা থেকে যুবতী হয়েছিলাম;
আপনজনদের সাথে নিশ্চিন্তে....

একদিন পরিচিত গণ্ডীতে এল এক আগন্তুক;
তন্ময় হয়ে দেখেই গেল মুগ্ধতায়;
প্রশংসার বন্যায় ভেসে মূল যেন হারালো মাটি...

সকলের বারণ, পিছুডাক অগ্রাহ্য করে
ভাগ্যান্বেষীর মত ভেসে গেলাম তার সাথে;
সেও কাটাই-ছাঁটাই করে সরা পাত্রে
বৃক্ষকে 'বনসাই' বানিয়ে রাখতে চাইল;
জল-মাটি-সারে পরিচর্যাও হল কয়েকদিন...

সখ মিটলেই গৃহকোণে বন্দিনী আমি;
ভুলতে বসলাম নিজের পরিচয়...

বুকের কাছে
ওয়াসিম আনসারি

বুকের কাছে কিছু একটা আটকে আছে...
সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া,
মেঘলা দিনের গুমোট।
নিঝুম দুপুরের পাতা ভাঙার শব্দ,
প্রবল উদাসীনতার মাঝে ভেসে ওঠা একছটাক অস্তরাগ,
ওদের সকলের জন্য কিছু লিখে রাখি,
তুমি তো জানো এসব ভালো নয়
একদম ভালো নয়
তবু আমি একটা গাছের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারি সারা জীবন,
বিরান শহরের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে
শিকড়ের টান নেই
শুধু ছেঁড়া ছেঁড়া বৃষ্টি।

তারপর... আবার!

রাজীব মৌলিক

পড়ন্ত গোধূলিতে ক্লান্ত ছেলেটি যখন পশ্চিমের সমুদ্রে ডুব দিলো;
ঠিক বিপ্রতীপ কোণে—
ঘুমন্ত মুখে উঁকি মারে বৌদ্ধের পূর্ণিমা স্বচ্ছ রূপসী।
শতাব্দীর কবরে ওড়ে উইপোকার খই;
নূতন কবরের সন্ধান পায় যেন
মহুয়া পলাশবন আর জামরুলের আঁধারে বিভীষিকার কলরব।
একটা বেঁচে থাকার আকুতি কেবল!
দোয়েল ময়না বুনোহাঁসের পাখনায় আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট,
মানুষের পৃথিবীতে অমানুষের চোখ।
নেশার নৈবেদ্য শরীর আর সিগারেটের ঠোঁট—
ছিঁড়ে খাচ্ছে বাঁকসার বিছানায় কচি পূর্ণিমার চাঁদ।
তারপর...!
ভোরের শহরে হাতেহাতে মোমবাতির মিছিল; আর!
বাতাসে মৃত্তিকা দূষণ আর বস্তাপচা শরীরের গন্ধ।
তারপর... আবার!

বন্দনা

দীপান্বিতা হক

এসো সবে বন্দনা করি তেত্রিশ কোটি দেবতার
ফুলে, চন্দনে, ধূপে, ধূনায় ধন্য করি মানবতার।
হোম, আরতি, যজ্ঞ করে বন্দনা করি তাঁদের
মিষ্টি, ফলেতে নৈবেদ্য সাজাই পূজার তরে যাদের।
মঙ্গলঘট, আম্রপল্লব, স্বস্তিকে সিঁদুর চিহ্ন
পারিপার্শ্বিক পবিত্র হলো দিয়ে আলপনা চিহ্ন।
ধুনোর গন্ধে, প্রদীপচ্ছটায় পাপ হলো দূরীভূত
পুজোর বাড়িতে অতিথি সবাই, কেউ নয় অনাহূত।
ঘণ্টা, কাঁসর, উলুধ্বনিতে মুখরিত হল মন্দির
মনের সকল মলিনতা গেল, ছিঁড়ে গেল সব জঞ্জীর।
স্তোত্র উচ্চারিতে পুণ্য কণ্ঠে পুরোহিত হল ধন্য
অনুধাবনে পুণ্যাত্মা হলো উপস্থিত লোকারণ্য।

নিকষ রঙের অন্ধকার

সঞ্জয় মণ্ডল

ভুলের প্রহর গুনতে গুনতে
আমলকী বনে চেনা অন্ধকার নেমে আসছে।
তা দেখে তুমি হয়তো বলবে
ওটা আমাদের পাড়ার...
তোমাদের পাড়ায় অন্ধকার বুঝি নিকষ রঙের হয়?
যে রঙের মলাট থেকে নতুন বইয়ের গন্ধ আসে না,
তাকে তুমি পাড়ার বলে অহংকার করো?
অদ্ভুত!
বোবা কান্নারা মুখ গুঁজে আছে মুখের ভিতর
অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির শেষ নোনতা স্বাদটুকু নিয়ে
তুমি কেমন ঝিমিয়ে পড়লে আবার...

শেষ বেলায় অন্ধকারের অহংকার মুছে দিতে
তুমি আশ্রয় নিয়েছো পরজীবী স্বর্ণলতার কাছে।

মন ভালো নেই

শম্পা চট্টোপাধ্যায়

জীবন থেকে জীবন নিয়ে জীবনকে ভালোবাসার চেষ্টা,
উপসী ঠোঁটের গায়ে লেগে আছে আজও সেই অতৃপ্ত চেষ্টা।
গাছেদের বাৎসরিক পাতাঝরা ছন্দে—
গায়ে গায়ে সেই কবিতা।
যে কবিতার সাথে আমার আজীবন দাম্পত্য।
ভুলে যাওয়া গানে অভিমানী সুর বিষণ্ণতা ঝরে।
ছাপ ফেলা ভালোবাসা সেই ছন্দের প্রত্যাশাতে বাঁচে।
পোষ্য ঘুড়ি ওঠে আর নামে অপোষ্য মেঘেদের গায়ে।
হঠাৎ কোন সে আলোয়—দিশা ছুটে এসে দাঁড়ায় আমার পাশ ঘেঁষে।
কুমারী গলি উষ্ণতা চায়, চায় নিবিড় ছোঁয়া,
আবরণীর কথায় ইচ্ছেরা বাড়বাড়ন্ত,
ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে থাকা দুরন্ত গতিটা—
বলে যেন আমারই মত মন ভালো নেই আজ।

পোড়াই স্মৃতির কাঠ

ননীগোপাল সরকার

সস্তা দামের দিন কিনে যেই ছাড়লি আমার সাথ,
শখের জীবন করল দখল ভোরহীন একরাত।
তোর বিরহের লাঙল এখন চষছে আমার বুক,
দু'চোখ ভেজার জল দিয়ে রোজ চাষ করি আমি দুখ।
তোর সাথে সেই ঘুম পোড়ানোর খুশির স্মৃতির ক্ষণ,
রোজ বয়ে যায় তুফান যেমন দুমড়ে মুচড়ে মন।
সোনার ফসল ফলার আগেই মার খেয়ে তোর থোরে,
স্বপ্নরা সব চিটের স্বরূপ পড়ছে নিজেই ঝরে।
তোর সুখে তাও মন সেঁকে নেই আবেগ বেচার হাটে,
বাঁচার রসদ বিদায়কালের আলতা মনের বাটে।
টোল পড়তো গালদুটো সেই অ্যালকোহলের ঘড়া,
রূপের মাদক কানায় কানায় থাকতো যেথায় ভরা।
নেশায় পাগল মনটা আমার দৃষ্টি দিয়ে পান করে তা,
ভাসছে এখন প্রেমের ধারায় বাঁধতে খরস্রোতা।
তবুও সেথায় সুখ খুঁজে পাই পুড়িয়ে স্মৃতির কাঠ,
মৃত্যু আমার গড়বে দেখিস টিমো কাব্যের মাঠ।

এ শহরের ওপর

সুমাল্য মিত্র

তবে তুমি কার দোষ দেখো
আমরা তো সবাই অন্ধ যে যার মতো
এ দেশ ভরে গেছে পোড়া বাঁশির সুরে
ভাগাড় থেকে এখন উঠে আসে
মানুষের বেঁচে থাকার রসদ
কখনো কলকাতাকে কেউ কাঁদতে দেখেছো
পার্কস্ট্রীট, নিউমার্কেট ছুঁয়ে রেখে
ঝাঁ চকচকে সপিংমল
বিভাবরী সুরে সুরে জেগে থাকে
এ শহরের ওপর থেকে কবে বলো
কলঙ্ক মুছে যাবে।

আসবো না

দীপক মুখোপাধ্যায়

ভিজে যাওয়া মেঘলা মন
কেউ কিছু বোলো না এখন
নীরব থাকি অকারণে কিছুক্ষণ
মন ভালো হলে পাঠাবো খবর
শেষ বিকেলের দমকা হাওয়া
কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে চিবুক তুলে
চুমু খাওয়া
অবাক চোখে দেখবি তুই
শেষ হবে আমার চাওয়া পাওয়া
পাগল করা তোর চোখের নজর
ঘোর লেগে যায় মনের ভেতর
বুঝিস না তুই বুঝিস না
অভিমানী মন বলে
আসবো না আর আসবো না।

বন্ধন

বিটন দাশ

বন্ধন মানে প্রাণের আকুতি
গভীর বিশ্বাস স্নিগ্ধ ভালোবাসা,
নির্ভরতা, সজীবতা, অনন্ত - অনন্ত !
বৃক্ষের মতো
তারও জলের তেষ্টা, সূর্যের আলো
মাটির প্রয়োজন।

অক্সিজেন জোগায়,
ছায়া দেয়,
ফুল আর ফলের ভাণ্ডার হয়
দহন করে।
সে চলতে পারে না
বলতে পারে না
কেবল দান করতে পারে।
দুর্যোগে হয়তো ভেঙে পড়ে
আবার গজিয়ে উঠে।
যে বৃক্ষের শিকড় যত গভীর
তার টিকে থাকার ক্ষমতাও তেমন।
বন্ধন বৃক্ষের অন্য নাম
বৃক্ষই বন্ধন।

ঘর ও বাহির

ঘনশ্যাম মণ্ডল

একটা নদীর ঘরে ঢুকলাম
বসে আছে এক বুক হা করে
জ্যৈষ্ঠের ফাঁকা মাঠের মতো,
গনগনে নিদাঘ এ পুড়ছে মরমী মন।
এক মুখ জ্যোৎস্না মেখে
আমাকে বলল বর্ষা আনো।

আমি চিতল হাওয়ায় কবিতা লিখি
লেখা শেষ হলে সৃষ্টিরা স্বাগত জানায়
আমি আপন কাজে বেরিয়ে পড়ি
নদী পিছু পিছু হাঁটে
হাঁটতেই থাকে অনন্তের সান্নিধ্যে

আমি পরিবেশে ছড়িয়ে দিই
আরো আলো আরো বৃষ্টি
বৃষ্টিতে ভর রেখে হাঁটে আমরা সৃষ্টি।

আমি কপাট বন্ধ করি
যাতে ঘরের ভেতর ও একটা বাহির থাকে।

আত্মহত্যা

কুমার প্রণবেশ

কারা যেন বলে গেল বসন্ত এসে গেছে
বিশ্বাস হয় না জানো সংগীতা,
তুমি এলে তবেই না ফুটবে ফুল,
সজনের সারি বেয়ে ভোর হবে রোজ।
ওই মগডালে গাইবে লাজুক কোকিল
বুকের ভিতর বয়ে যাবে রূপনারায়ণ, হলদি নদীর মাতাল ছন্দ।
তুমি ছুঁয়ে দিলেই রক্ত মেখে কৃষ্ণচূড়া হবে লাল,
আদিবাসী বাতাস এসে
নগ্ন করে দেবে দু'একটা ডাল।
আমি তখন তোমার আঁচল ভরে কুড়িয়ে দেবো পলাশ...
খোঁপায় দেবো অশোক, বুনো পায়ে বেঁধে দেবো শিমুলের ঘুঙুর।
বেলা গড়িয়ে এলে নেশাখোর সূর্যের মদের গেলাস থেকে কিছুটা মদ
আমার পিচকারিতে ভরে ছিটিয়ে দেবো তোমরা সারা গায়ে।
সাঁওতাল রাজকন্যার মতো তোমার রাঙা ঠোঁটে তখন দেখব জাহান্নামের হাসি,
নীল চোখে সর্বনাশের ইশারা
ডাগর বুকে আকণ্ঠ গরল পানের আমন্ত্রণ।
শুনবো কান পেতে তোমার উত্তাল বুকে মহাসাগরের গর্জন,
হয়তো ততক্ষণে হারিয়ে গেছে আমার মোহনবাঁশি অগাধ জলে,
দিশাহীন নাবিকের মতো স্বেচ্ছায় হাল ভেঙে আমি
ক্রমশ তলিয়ে যাবো সমুদ্রে তোমার
জানো সংগীতা লোকে বলে আত্মহত্যা মহাপাপ,
সাত জন্মেও জন্ম হয় না তার।'

অপেক্ষাকৃত

বিকাশ বিশ্বাস

দোর্দন্ড প্রতাপ বৈশাখের অসহ্য তাপদাহ
তাপাঘাতে জেরবার হাঁসফাঁস প্রাণ
অপেক্ষাকৃত স্বস্তি আগুন বলয় থেকে
বেপরোয়া কালবৈশাখীর শীতল অবদান!

আশীর্বাদ

রামচন্দ্র ধাড়া

কেন ফিরে যাবো বলে স্পর্দ্ধা করিনে—
ফিরতেই হবে একদিন
মৃত্যু কাউকে করে না রেয়াত!
সুগভীর রহস্যের মায়াজালে ঢাকা
সে-জগতে একদিন ফিরতেই হবে।
আমি যেন বৃন্তচ্যুত কুসুম কোরক
একদিন নিঃশব্দে ঝরে পড়েছিলাম
মাটির এ পৃথিবীর সুকোমল বুকে

শৈশব যৌবন প্রৌঢ়ত্বের কাল
পার হয়ে লোলচর্ম শুভ্র পক্ককেশ
অঙ্গজুড়ে কত না যন্ত্রণা!
ঘাটে বসে আছি শেষ খেয়ার আশায়।

কিছু কাজ করেছি নিশ্চয়
অনেকটাই বাকি রয়ে গেছে।
উত্তরপুরুষ! তোমরা তা পরিপূর্ণ করো!
বহু স্বপ্ন দিবাস্বপ্ন হয়ে
ঝরিয়েছে নোনাজল দৃষ্টি ঝাপ্সা করে
ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ফেলে
তোমাদের বিড়ম্বনা বাড়াবো না আর
আমাকে বিদায় দাও হাসি হাসি মুখে
উত্তর পুরুষ!
সর্বকর্মে জয়যুক্ত হও!

জীবন-মরণ

ফউজুল হক

জীবন—
আমি কতো সুখে মানুষের মনে
বেঁধেছি স্বপ্নের বাসা,
আদর করে রেখেছি যত্নে
পাই আমি ভালোবাসা।
তোকে কেন বাসে না ভালো?
জানিস কি তুই মরণ?
রক্ত মাংস ওঠে কেঁপে কেঁপে
করলে তোকে স্মরণ।
তুই যেন এক গভীর অন্ধ
সবাই তোকে ভয় পায়,
আমায় নিয়েই মত্ত সবাই
তোকে কেন ভুলে যায়?

মরণ—
আমি বলছি কথা
মন দিয়ে শোন জীবন,
সর্ব সত্যের সত্য আমি
বেদনা দায়ক মরণ।
তুই সব মিথ্যার বড় মিথ্যা
তাই যত্নে রাখে ধরে
সদাই আমায় এড়িয়ে চলে
যাতে তোকে না নিই কেড়ে।

এক অ-আধ্যাত্মিক কবিতা

রঞ্জন চৌধুরী

কেউ কেউ বলে
ও ভালো নয় ও ভালো ও মন্দ ও সুন্দর....

ও মানুষ তুমি কী তেমনি বিচার্য!
ও মানুষ তুমি কী এমনি গ্রহণীয়!

কই দেহজন্ম ধারায়
এমনটি তো নির্দিষ্ট ছিল না কখনো—
তবে কী পূণ্যাহের পরিবর্তে পাপ
আর পাপের পরিবর্তে পূণ্যাহের দোলাচলে
বাসা বেঁধে থাকে কোন এক ভবিষ্যৎ
প্রবাহ কোটরে
যার সাক্ষী সে নিজেই!

বিচারে বসে
মানুষের খোঁজ চলে মানুষকে
আর দৃশ্য, শ্রবণ ও হৃদয়ের ভাষা
কলরব করে ওঠে— কে সত্য
এই যোগ্য আদ্যান্ত অনুসন্ধানের অধিকারে।

একটা সময়

উৎপলকুমার ধারা

একটা সময়ে জানি অনেক কথায়
সারাদিনের স্বরলিপি
লেখা হয় খুব সরলতায়!

তারপর! ঘুমজুড়ে স্বপ্নখিদে
চোখের পাতায় বিজ্ঞাপনের ভীড়
নেশা দেয় বাঁচার তাগিদে!

একটা বয়েস পেরোলেই শেষ
যতো ভালোলাগা-ভালোবাসার
সুখে বেঁচে থাকার সব বিশ্বেস!

এক সময়ে রক্তের অহংকার যদি
কাঁড়ি কাঁড়ি কতো ভালোবাসা
কাছে টানে খুশির স্বাদ নিরবধি।

সময় পেরোলেই ভালোবাসার গান
আর শুনতে ইচ্ছে করে না...
ছাই চাপা পড়ে যায় সব অভিমান!

আগামীর আশ্বাসে

মনীষা দে

তবু... যদি সত্যিই এইভাবে
মন খারাপের ভার তোমার বইতে পারি
তবে—যাক্ না জগৎ অন্য কোথাও
আমি আমার যা কিছু
তোমায় দিয়ে দিতে পারি।

সাত বছর নাকি সাত আলোক বর্ষ পথ
কি হবে কাগুজে হিসাব মেনে
এই বেশ ভালো আছি মন খারাপের সাথে
তোমার মনে আছি এইটুকু জেনে।

বছর ফুরায়ে আসে চৈত্রের দুপুরে
সব চৈত্রে হয় না তো সর্বনাশ
কখনও হয় তো ঘুরে আসে কোনো পৌষ
দাঁড়িয়ে চৌকাঠে বলে—
'এ আমার বিশ্বাস।'

সেদিন হোক্ না মিছে কোনো একদিন
হিসেব শাসন আমি মানতে নারাজ
কাল চলে গেছে কাল পানে
আগামীর আশ্বাসে তুমি সত্যি আজ।

তথাগত ও প্রেয়সী

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

দু হাজার বছর আগে বুদ্ধের বাণী
জ্বালাময় পৃথিবী
মন জ্বলে দেহ জ্বলে বাইরে প্রকৃতি জ্বলে
জ্বলা থেকে মুক্তি নেই কারও।
তথাগতর বিবর্তনে
মানুষ হয় নিঃসঙ্গ
নিঃসঙ্গতার জ্বালায় ধ্বক ধ্বক।
প্রেয়সীর মুখ চাঁদ
তার রশ্মিতে শরীর জুড়োয়
বাহু নয় কারও অধীন।
মনে হয় দু বাহুতে চাঁদমুখ
ঢাকা হোক।
দিন রাত মাস বছর ধরে
শুধু থাকুক সে আমারই।
তথাগত, শ্রেষ্ঠ হওয়া গেল না
তপস্যায় পাপ
তথাগত, ক্ষমা করো
প্রজন্মের অপেক্ষায় আছি।

এক আকাশ

মাসুদুর রশীদ

আমরা পালাই, কেবল পালাই
কখনো ভাবিনা দেখ্
মাথার উপর আকাশটা কিন্তু এক।

হারিয়ে যাই, হারাই;
কখনো ভান করি ঠিক—
হারিয়েছি কিনা আদৌ পরিচিত দিক।
চেনা রাস্তাগুলো যেন ভুল, যেন জানতাম
কোন সুদূর কালে,
অথচ চোখে ঝলমল করে নাম।
কখনো কালো করে যখন আকাশটা মেঘে সাজে
চোরাগলি ঘুরে ঘুরে যেন মন, কাঁদে কখনো বাজে।
কি লাভ মিছেমিছি ভুলে থাকার উপক্রমে
দিন দিন বাঁচিয়ে রাখার রসদ খুব ধীরে ধীরে কমে।
তবুও মুখে হাসি, ভালো আছি রাস্তায় শোবার ঘরে
সুখ কিনি ছাপা কাগজে ক্লিশে মানুষের ভিড়ে।

একদিন ঠিকই বোধ জেগে যাবে,
কী ক্ষতি হত যদি আধেক
কাটাতি জীবন সব ছেড়ে?
তখনও কিন্তু মাথার উপর আকাশটা থাকতো এক।

প্রতিবাদ

অঞ্জনা দাস

রক্ত দেখে ভয়?
তোমার কাছে মা এই রক্ত
নতুন কিছু তো নয়!
দেখেছো তুমি মা পলাশী যুদ্ধ
দেখেছো কুরুক্ষেত্র
জালিয়ানওয়ালাবাগ, হত্যাকাণ্ড
নির্বাক নিস্তব্ধ।
রবীন্দ্রনাথ গর্জে ওঠেন
নাইট উপাধি ত্যাগে
গান বাঁধলেন—এই মনিহার
আমায় নাহি সাজে।
পার্থ সারথি কলিতেও আছে
আছে পাঞ্চজন্য
ব্রহ্মাস্ত্র আজও আছে
ওই রাবণের জন্য।

রক্ত দেখে ভয়?
তোমার কাছে মা এই রক্ত
নতুন কিছু তো নয়!

বিবাহিত জীবন

শচীদুলাল পাল

বিবাহ মানে এক সুহানা সফর
শুরুটা ভোগ্য, মনোরম, সুন্দর।
একসাথে চলার দীর্ঘ পথযাত্রা,
পরে সমস্যা আনয়নের রাস্তা।
অভূতপূর্ব সমস্যার পরিদর্শন,
কন্টকাকীর্ণ, দুর্গম সংসার বন।
নিরীহ হরিণের রাজত্ব, রমরমা,
বাহাদুর সিংহের নেই ক্ষমা।
প্রথম প্রথম 'এই শুনছ কি'?
পরে 'কালা হয়ে গেছ নাকি?'
প্রথম প্রথম 'কেউ হয় না তোমার মতো জগতে'
পরে 'তোমর মতো অকর্মণ্য কেউ নেই ভু-ভারতে।'
'এমা তুমি কেন, আমি করব সারা'
পরে 'তুমি রাখো, কিচ্ছু হবে না তোমার দ্বারা।'
'অনেক ভাগ্য জোরে বিয়ে তোমাকে আমাতে।'
পরে 'ভাগ্যটাই খারাপ, এই ছিল বরাতে।'
বিবাহিত জীবন মানে ভুস্বর্গ কাশ্মীর,
সুন্দর, মনোরম, নৈসর্গিক ভাবগম্ভীর
পরে তর্ক, বিতর্ক, কলহ, ঝামেলা,
আতঙ্কবাদী বোমা, কান ঝালাপালা।

চিঠি

ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি এখন বন্ধ রাখছি ফোন
তুমি হয়তো অনেক দূরে কোথাও
ব্যস্ত আছো মগ্ন সারাক্ষণ
আমি এখন বন্ধ রাখছি ফোন

আমার ঘরে বন্ধ দুয়ার, রাত
অঝোর ধারায় বৃষ্টি যখন তখন
বুকের মধ্যে ভিজছে একা মন
আমি এখন বন্ধ রাখছি ফোন

এখানে এই সবুজ ধানের ক্ষেত
অরণ্যপথ হারায় গহীন জীবন
আকাশ বাজায় দুরন্ত জলনূপুর
আমি এখন বন্ধ রাখছি ফোন

তুমি হয়তো দাওয়ায় মাদুর পেতে
অন্য কারোর সঙ্গে কাটাও সময়
আমার ঘরে একটা গোটা শ্রাবণ
আমি এখন বন্ধ রাখছি ফোন।

আন্দোলনের ডাক

কাঞ্চন কুমার মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন পর
রাস্তাটা তার কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে
নদীর ওপর হতে আসা
আর একটা শীর্ণ রাস্তার হাড়জিরজিরে হাত চেপে ধরল—
তারপর ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল—
'আমাদের তো হারাবার কিছুই নেই,
এসো আমরা আন্দোলনে নামি।'

ফোঁটার অশ্রুমালা

স্বর্ণালী দে সোম

আমাকে বলা সমস্ত কথাগুলো ছিল
তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো
যা নীলে উন্মুক্ত করেছি আমি।
ক্রমশ দিন, দিন থেকে রাত
কাটিয়ে কাটিয়ে তেপান্তর পেরিয়েছি আজ।
বিক্ষোভের গভীরতা জমে গড়ে উঠেছে
নক্ষত্রখচিত রাত্রি!
তারাঝরা আকাশে
মৃদু আলো-আঁধারের মত্ততায় পুতুল খেলার
সমাপ্তিকাল নির্ধারিত হলো,
আগামী রক্তিম প্রভাতে।
চাতকের সমস্ত তিয়াসাকে
জ্বলন্ত আগুনের ন্যায় পান করেছি নিঃশব্দে।
প্রদীপ জ্বালতে চেয়েও
জ্বেলেছি ক্রমাগত অন্ধকারকে।
তুমি কথা রাখোনি।
আমাকে দেওয়া প্রতিটি কথা
আজ কেবলই শব্দমাত্র।
ফিরতে চেয়েও পেরোতে পারবো না তেপান্তর।
তারাঝরা রাত্রিকাল পেরিয়ে এসেছি আজ।
সময়ের স্রোতে ভাসছে জীবনকাল।
সময়ের কাছেই বাঁধা পড়েছে সময়।

ফসলের দাম

জয়িতা ভট্টাচার্য

রাতভর স্বপ্নেরা ঘুরপাক
চাঁদভরা আকাশের অভিসার
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেয় ডাক
পাতা ঝরে, ঝর ঝর ঝর ঝর।

ডোম পাতে আগুনের শয্যা
ওরা আসে ভালোবেসে নদীখাত
ওরা বাসে পাথরের শয্যা
খসে পড়া পাতা লেখে দাসখত
মাঝরাত ভালোবাসে রাজপথ।

ছন্দবদ্ধ আসে পিঁপড়ে
আমরা ব্যাকুল হই রক্তে
রক্তই জীবনের হয় ঘাম
কতরাত ভুলে গেছে সেই নাম
অজান্তে ফসলকে ভালোবেসে
কাস্তেতে দেয় শান অবশেষে।

মানুষ নেয়

জীবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্রোধ যখন রোদের চাবুকে ক্রমশঃ নমনীয় হবে
ক্রূরতা যখন বাতাসের তীক্ষ্ণতায় নরম নদীর মতন হবে
আমি যাব, আমি যাব সভাস্থলে, বৃক্ষশাখা তলে
পায়ে পায়ে মিছিলে
অকারণে নয়, কিছু পেতে নয়,
মানুষের তরে...
উন্মত্ততাকে বলি দেবে কে? বিসুভিয়াস?
অনৈতিকতার দাবানলে ঘর-সভ্যতা পুড়ে খাক
এ কেমন সত্যতা যা মিথ্যের মোড়কে ঢাকা
অথবা বিপরীতেও
অবিরত অবিরাম!
স্বীকৃতি পাওয়াও যায়, কে দেয় কেন দেয়
মানুষ নেয়
দিবসে নিশীথে মনের হরষে
বিকল্পহীন মরীচিকায়!!

মায়া-মরীচিকা

মাহমুদ কামাল

এই ঘর, ব্যবহার্য সকল তৈজস
রাগ-অনুরাগ
শ্বাস-প্রশ্বাস আর হাতের বন্ধন
রক্তসূত্র—
শুদ্ধতার যতো অহংকার
চেনাপথ—পরিচিত শব্দাবলী
উশ্‌কে ওঠা প্রিয় স্মৃতিগুলো
কিশোরীর বিস্ফারিত চোখ
মনে রাখা একটি বিকেল
অপরিচয়ের গ্লানি
যাবতীয় ভুলগুলো
উশুম-কুসুম ভোর নাকি চোর
শীত-রৌদ্র
গাছগুলো এমনকি নুয়ে পড়া গাছের পাতাও
প্রিয় মুখগুলো
এইসব এইসব—এসবই তো মায়া
মায়া-মরীচিকা....

বটগাছ

তারকেশ্বর চট্টরাজ

ছোটবেলায়
আমার গাঁয়ের দক্ষিণ থেকে
পশ্চিম বরাবর
অজয় নদীর ভাঙাল ধরে হেঁটে গেলে
অনেক কাশফুল আর
কদবেল গাছ পেরিয়ে
পেয়ে যেতাম একটা বিরাট বটগাছ,
পাশ দিয়ে মাটির সরান পথ
বহুদূর কোনো গাঁয়ে গিয়ে মিশেছে।

দিনের বেলাতেও
অসংখ্য ঝুরি নামা বটগাছটার তলাটা
ছায়াবৃত অন্ধকার
কতরকম পাখির ঝটপটানি—
কুজন।
অনেকদিন চেষ্টা করেছি
বটগাছটার মূল কাণ্ডটা খোঁজার—
পাইনি,
কেউ কোনোদিন দেখওেনি সেটা।

হতাশ হয়ে দোল খেয়েছি
ঝুরিতে ঝুরি বাঁধা দোলনায়,
গেয়ে উঠেছি গান পাখির মতো,
দূরে ফসল ভর্তি মাঠ
কোথাও আলপথে চাষি
উদাস বাউলে পেয়ে বসত আমাকে,
বিশাল বৃক্ষের ছায়ান্ধকারে
এক ভাবুক কিশোর
যেন দুর্জ্ঞেয়তার শিকার।

তোমার চাপকান পরা
দীর্ঘদেহী ঋজু মূর্তিটা
আর শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত
তীক্ষ্ণ চোখের দুর্জ্ঞেয়তায়
আজও এক তেমনই শিকার হয়ে
উদাসী বাউল আমি,
হারিয়ে ফেলি সত্তার সমস্ত পরিক্রমা
পঁচিশে বৈশাখ থেকে
বাইশে শ্রাবণের সৌরভে।

নিজের মধ্যে

তাপসী ভট্টাচার্য

গ্রাম্য আঁশে লেপটে আছে গা
যতই হই পরিপাটি গাথা
সভ্য জগৎ বলবে অভাগা
অতীত ফিরে দেখলে মাটি মাখা
গুটির ভিতর অনেক মূল্য ভরা
বিষের মধ্যে অমৃত অধিক
আপন গুটি দামী সুতোর খেলা
মালা গাঁথে আপন সফল প্রতীক।

হাজার কাঁটার মধ্যে মূল রস
কষ্ট আপন গাঁথা গুটির ভিতর
জীবন লড়াই গড়া বন্ধ ঘরে
প্রকাশ রঙীন জগৎ অন্তরে।

কবির অনুভব

পান্নালাল মল্লিক

কবিকে জানিনে একথা জনে জনে
জানান দেওয়ার দরকার নেই।
কোথাও এমন মানুষ কি নেই
জোটেনি একবারও কবির পরশ....!
ফুল হয়ে ওঠার যে আনন্দ, কুঁড়ি তার
সবটুকু ধার করে নেয় কবির অনুভব থেকে।
তাত লেগে ঝলসে ওঠা মানুষ যখন
লড়াই লড়াই বলে রব তোলে
সেই সুরটুকুও মানুষ ধার করে নেয়
কবির অনুভব থেকে।
ভয়াল রূপ প্রকৃতির লাল চোখ
বারিপাতের সূচনাকে যখন প্যালা দেয়,
আমাদের পরাণ তখন আই-ঢাই করে—
আমরা কবির অনুভব থেকে খুঁটে নিই
কিছু সুর ....
জল দাও হে রুদ্র নিষ্ঠুর ভীষণ বৈশাখ।

শব্দাবধি

আসিকার রহমান

শব্দে আছি নৈঃশব্দেও আছি
শব্দ ও নৈঃশব্দের খেলা চলে
কানামাছি কানামাছি ....
শব্দাবলীর শরীর জুড়ে ভাঙচুর
নৈঃশব্দেও শিকড়ের আস্ফালন
হেঁটে চলে চলে পিঙ্গল নদী
শব্দাবধি...

স্রোত

তপন মুখোপাধ্যায়

রাত বাড়ে ...
হাওড়া ব্রীজ ছোটে
ঘরমুখো পথচারীর সাথে
স্টেশনের দিকে।

রাত বাড়ে ....
রাজপথে বাইক
প্রাণ হাতে যৌবন ছোটে
বেপরোয়া।

রাত বাড়ে....
সারসার এলোমেলো বিছানায়
ভবঘুরে, ভিখারী
শহরের ফুটপাত দখলে

রাত বাড়ে...
উর্দিধারী পুলিশ ভুলে যায়
প্রাকৃতিক কাজ সারে সেখানে
"এখানে—করিবেন না।"

রাত বাড়ে...
হুল্লোড় বেহিসাবী জীবন
পার্কস্ট্রীটে রেস্তোরায় বারে বারে
ভীড় বাড়ে।

রাত বাড়ে....
ফুটপাতে একটু সোহাগের তরে
নাছোড়বান্দা মরদ
তখনো জেগে।

রাত বাড়ে রাত বাড়ে...
ঝলমল শহরে চেনা চেনা কান্না
কামদুনি কন্যা—
রক্ত চুঁইয়ে পড়ে দুধারে।
রাত বাড়ে রাত বাড়ে....

মৃত্যুর অধিক

আব্দুল্লাহ্ আল রিপন

রাত্রি গভীরতম, উজ্জ্বলতম জ্যোৎস্নায়!
গাছেদের মাথার ভেতর থেকে ওঠা
জমাট অন্ধকারে, কবিতা পাঠ করে জোনাকিরা....
‘মৃত্যুর চেয়ে অধিক মৃত্যুময়
আজীবন মৃত হয়ে থাকা
হৃদয়-মঞ্চের পর শূন্য হয়ে ভাসা
জীবন-মৃত্যুর চুমুকে চুম্বনে।’
তারপর নিভে গেল আলো, নিভলো অন্ধকার!

বুঝিবা এদের মৃত্যুর কোলের ভেতর রেখে
প্রতিবার আর এক খিলি পান খোলে প্রকৃতি
খুলে যায় বুঝি অখিল নিখিলের নীল
ঘুমে ও জাগরণে, তন্দ্রায় কেবল মৃত্যুমিছিল
উথলে ওঠে ধমনির দুধ।
কোন রমণী সে-বা সামলায় জ্বাল এমন নিখুঁত!
উছলায়; ছলকাবে না!
জানে কি জোনাকির পিতা....
বঁটির চুম্বনে কৈয়ের যাতনা
মৃত্যু হতে থাকা আর মৃত হয়ে যাওয়ার মাঝে
যাতনাবলক ওঠে কতবার কতটা
মাংসে মগজে কতটা গভীরে বিঁধে গেলে
দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়ে রক্ত খুলে আনে ছুরি
ছিঁড়ে যেতে থাকে রুহবটবৃক্ষের শেকড়, নরম মূল!
‘যতটা গভীরে ধার
ততটা গভীরেই
আমি তার।’
শেষ হয় রাত, আলোতে তলায় কবিতা আঁধার!

স্বপ্ন খেলা

বৈশাখী মৈত্র চ্যাটার্জি

মন আকাশে কালো মেঘ
বৃষ্টি চোখের পাতায়।

মন আকাশে তোলপাড়
ঝড় শরীরী ভাষায়।
মন যেতে চায় সুদূর পানে
অতীত ঘিরে স্মৃতির পাতায়
দুঃখ সুখের দোলা চলে
জীবন যে যায় স্রোতের টানে।

মন পাখি চায় উড়ে যেতে
ঝল্‌মলা মেঘ আকাশেতে

মন মাঝারে মেঘের ভেলা
রামধনু রঙ স্বপ্ন খেলা।

নির্যাতিতা
প্রদীপ ভট্টাচার্য

তোর শরীরে বৃশ্চিকালি, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর
কি করবি, বল্ মেয়ে তুই, সিংহাসনে দুষ্টগ্রহ

রাষ্ট্র তো চায় বোরখা আড়াল, দিন কাটাবি নির্বিবাদে
কেন যে তুই দরজা খুলিস, মুখ খুলে যাস প্রতিবাদে

মাঝে মধ্যে দস্যু এসে খুবলে খাবে মেয়ে শরীর
মেনে নিবি মুখটি বুজে কিংবা নিবি কলসী দড়ি

কাজী-পাজি-রাজা-উজির, এদের কি তুই বন্ধু ভাবিস!
সাবধানে বোন, এই কটা দিন, বাচ্চাটাকে আগলে রাখিস্।

কংস জানে কৃষ্ণ কথা, হারিয়ে হয়তো যাবে ছেলে
রাষ্ট্র বলবে যথা তথা, মায়ের সাথেই আছে জেলে।

দেশ জুড়ে আজ রাত্রি ঘন, সিংহাসনে দুষ্টগ্রহ
চল্ বোন সব, সবাই মিলে জেগে থাকি অষ্টপ্রহর ....

সাবধানে বোন, আর কটা দিন বাচ্চাটাকে আগলে রাখিস।

কবিতারা কাঁদে মধ্যরাতে
সামিউল ইসলাম ইমন

কবিতাদের শরীরে কোনো ক্ষত নেই
তবুও তারা কাঁদে।
মধ্যরাতের সকল স্তব্ধতাকে ভেঙে
ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কবিতার শরীরে কোনো ক্লান্তি নেই
তবুও কোন এক অব্যক্ত দুঃখে
মায়া কান্নায় ভেঙে পড়ে।
কখনো অনাবাদী জমির আলপথে দাঁড়িয়ে
তরুণ কবির দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ক্ষণে-ক্ষণে কেঁদে ওঠে।

কবিতারা শুধুই কাঁদে
নিষিদ্ধ কবির সাহচর্য পেয়ে, তবুও তারা কাঁদে।
তারা কাঁদে; ক্ষণে ক্ষণে একাকী কাঁদে।

হলুদ খাম
রাহাত রাব্বানী

এতটা মনে পড়েনি আগে, কসম—
এতটা মনে পড়ে না কারো।

যতটা মনে পড়লে বিষাদ জমে বুকে,
যতটা মনে পড়লে চোখে মেঘ জেগে ওঠে,
অতটা মনে পড়েনি কখনো ; কোনোদিন,
দিব্যি এই বাঙলা জননীর। আমিও একদিন—
চাঁদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছি এ বাড়ি ও বাড়ি,
পুকুরের জলে দেখেছি মাছেদের অনিরাপদ সঙ্গম,
হেমন্তের হলুদ খামে লুকিয়েছি ভালোবাসার চিঠি,
কুয়াশার উত্তরীয় জড়িয়ে দেখেছি খেজুর রসে কৌতূহলী চোখ,
লাঙ্গল কাঁধে পূর্বপুরুষের বাড়ি ফেরা; তাদের দৃষ্টি জুড়ে
প্রেমের প্রতিসরণ-প্রতিফলনের সূক্ষ্ম নিয়ম। কসম কাদামাটির,
এতটা প্রেম দেখিনি কোথাও, কোনোখানে।
লেখেননি কেউ।—না রবীন্দ্রনাথ; না জীবনানন্দ।

এতটা মনে পড়েনি আগে,
কোনোদিন,
কোনোসময়—
হারানো ছেলেবেলা আমার।

নতুন সময়
তপনকুমার দাশ

কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে
কিছু বলতে ভুলে গেছি,
দেয়াল ছুঁয়ে ফিরে
সব হারানোর মাঝে এসে
বসন্তের রঙে মুগ্ধ হয়েছি
রঙিন মায়ার হাতছানিতে মন মজেছে

একটু একটু করে অন্ধকার মুছে যাচ্ছে
ঊষার রাঙা আলোয় দিগন্ত রঙ মাখছে
আমরা রঙিন হয়েছি,
সময়ের ভেলাতে ভাসতে ভাসতে
সবাই নতুন হয়েছি,
শতাব্দির সোনালি সৈকতে দাঁড়িয়ে
কান্নার বদলে হাসতে শিখেছি।

মানভঞ্জন

সমিতকুমার হালদার

তুমিই বলো, কী চাও?
দিতে পারি ভোরের শিশির,
এক ফালি রোদ, শিউলির গন্ধ ....
নিদেনপক্ষে পাতাঝরার মরশুম!

বলো না, কী চাও তুমি?
দিতে পারি এক আকাশ নীল বৃষ্টি,
এক মুঠো সবুজ, মাটির সোঁদা গন্ধ ....
নিদেনপক্ষে দোলযাত্রা, দুর্গোৎসব!

এখনো কি অভিমান আটকে আছে
বুকের মাঝে; জোঁকের ন্যায়।
শুষে নিচ্ছে ধেয়ে আসা ইচ্ছেশক্তি।

বলছি তো...
দিতে পারি এক খণ্ড সোনালী পাহাড় চূড়া,
স্রোতস্বিনী নদী, গভীর অরণ্য ....
নিদেনপক্ষে বেদুইন জীবন।

কিছুই যদি না চাও...
তবে দিতে পারি এক পশলা জোছনা রাত,
জোনাকির আলো, আতরের গন্ধ ....
নিদেনপক্ষে শীতঘুম, পার্থিব সুখ!

যদি তাও না চাও—
তবে, দিতে পারি একরাশ অবহেলা,
উদাসীনতা, বিরহ বেদনা ...
নিদেনপক্ষে অন্ধকার কানাগলি!

ভালোবাসাটাই শুধু মরীচিকা যেন
অকারণ অনুধাবন। কুয়াশায় ভরে মন।
পড়ে থাকে শুধু সম্পর্কের দু মুঠো ছাই...
মানভঞ্জনের শর্তাবলী রেখে গেলে বেশ হয়!

শরতের আগমনী

অঞ্জলি দেনন্দী

শাখে শাখে,
কুসুম লাখে লাখে
অলিদল, ঝাঁকে ঝাঁকে,
গুনগুনগুন .... করে,
শোনায় আগমনী গান,
আর ভরে যায় প্রাণ।
নদের বাঁকে বাঁকে
হংসী, হংস, জলের পরে
আল্পনা আঁকে।
আকাশে উড়ন্ত হাল্কা মেঘদলে
হাওয়ার পালকী চড়ে
উড়ে উড়ে চলে ....
আলোকের পালক লেখনী,
প্রকৃতির হৃদয় পাতায়, পাতায়,
লেখে আগমনীর কবিতা।
শারদ পূর্ণিমার চন্দ্র,
মহাসাগরের জোয়ারে, উত্তাল ঢেউ তোলে।
আর সাথে স্বশব্দে বলে—
হে! প্রিয় নিশি, প্রেম করতে কি শেখনি?
এসো! আমার থেকে শেখো মন মিতা!
ওদিকে, ধ্রুবতারা তো, রয়েইছে জ্বলে,
ভালোবাসার স্থির আলো জ্বেলে।
শরৎ রানী পৃথিবীর পরে দেয় ঢেলে,
তার চিরনুতনের সৃষ্টিরে।
সুস্বাগতম তার সুদৃষ্টিরে।

কবিতা তোমায়

বটুকৃষ্ণ হালদার

আষাঢ়ের ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ঝরা রাতে কিম্বা শীতের হিমেল হাওয়ার মাঝে
ঘাসের উপর শিশিরে রাঙানো প্রাতে
তোমায় কত করে খুঁজেছি কবিতা
হৃদয়ের যন্ত্রণা ভাব প্রকাশের আবেগ উত্তাল স্পর্শের ঢেউ
আমায় বুঝতে দেয়নি
বসন্ত প্রাতে আনমনা হয়ে সংগোপনে এঁকেছিলাম ছবি তার
কবিতা তোমায় কত করে খুঁজেছি কোলাহল পার্ক রেস্তোরাঁ
লাল মাটির নির্জন ছাতিম তলে
যদি পাই তার দেখা
মেঠো লাল মাটির পথে কৃষ্ণচূড়ার ঝরা পাপড়ির
উপর দিয়ে হেঁটে চলব দুজনে
শোনাবে দোয়েল কোয়েল মিষ্টি সুরের গান
শুধু একটি বার হাতে হাত চোখে চোখ
ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শোনাবো এই হৃদয়ের কথা
ক্ষণিকের তরে জুড়ে রবে আমার প্রাণ
একাকীত্ব মনের চিত্ত খুঁজে না পাওয়ার বেদনায়
ভারাক্রান্ত মন, বোঝাব তুমি আছো এ হৃদয়ের একান্ত আত্মসংগোপনে
নির্বাক ঝাপসাটে নয়ন এর দৃষ্টি আবছা চশমার কাঁচে
আজও তোমায় খুঁজে চলেছি কবিতা
চলন্ত ট্রাম ট্রেন বাসে
তোমাকে খুঁজেছি বারে বারে কবির কবিতায়
নয় তো শিল্পীর রং তুলির ক্যানভাসে

আয়না

ফটিক চৌধুরী

যে গাছটি ছায়া ফেলে পুকুরের জলে
সে তার আয়নার কাজ চালিয়ে নেয়
আমিও শব্দের ভিখারী, দিনরাত
ক্ষুধা মেটাই কবিতার পাতায়।

তোমার মুখের মতো দর্পণ কোথায় পাই
যেখানে কোনো প্রসাধন লাগে না।

দিনগুলো নিজেরা যেভাবে কাটায় কাটুক
তারা সকালকেই নিজেদের আয়না ভাবে।

এলোমেলো

ডালিয়া মুখার্জী

কয়েকটা কঙ্কাল
ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকে গাঢ় আঁধারে,
ফণীমনসার সূচালো কাঁটাগুলো
এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় কঙ্কালগুলোর পায়ের পাতা,
একটা ভীষণদর্শন প্রাণী
কোথা থেকে এসে উপস্থিত হয় আঁধারের মধ্যেই,
প্রতিটি নিঃশ্বাসে ঝরে পড়ে অমৃত,
ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে
কঙ্কালগুলোর শরীর অমৃতের স্পর্শে নড়ে ওঠে
প্রাণীটা এগিয়ে গিয়ে কঙ্কালগুলোর গায়ে
চামড়া মাংস লাগিয়ে দেয় নিজের শরীর থেকে ছিঁড়ে,
প্রাণ পায় কঙ্কালগুলো,
জেগে উঠে ছিন্নভিন্ন প্রাণীটিকেই
হত্যা করে ভয়ঙ্কর এক শত্রু ভেবে,
আঁধারের মধ্যেও রক্তের গাঢ় লাল রঙে বিষণ্ণতার ছাপ
চোখে পড়ে না সদ্য প্রাণ পাওয়া শরীরগুলোর...।

ডানাভাঙা স্বপ্ন

তপনকান্তি মুখার্জি

বিলুপ্ত শব্দকথারা এখন ভিড় করে স্বপ্নে
বিলুপ্ত মুখেরাও।
ঘুমের মাঝে প্রতি রাতে স্বপ্ন বদল হয়,
বদল হয় মনের ক্ষতও।
রাতপাখির পাখশাটে যখন দিগন্তপারে
শেয়ালেরা ডেকে ওঠে,
জ্যোৎস্না মাখে বকুল-কামিনী,
তখন আধো আধো চেতনায় জন্ম নেয়
নতুন স্বপ্ন নতুন ভাষায়।
অচিনপুরে মেঘ জমে, বৃষ্টি হয় দিকশূন্যপুরে।
ঝড় ওঠে, স্মৃতি ওড়ে,
লতাজড়ানো মাটির কুঁড়েতে ডানাভাঙা স্বপ্নে
খেলা করে কত কত কথকতা রাতের সরণি বেয়ে।

তুমি

কাশীনাথ দাশ চাকলাদার

এক

তোমার বিকল্প নেই বৃথা অন্বেষণ,
তুমি আছ আশৈশব তোমার মতন।
সূর্য যায় অস্তাচলে গোধূলি বেলায়,
আঁধারই তো জ্বেলে রাখে পরম যতন।

দুই

তোমার বিকল্প নেই বৃথা অন্বেষণ,
তুমি আছ আশৈশব তোমার মতন।
স্মৃতি হয়ে ফোটে কলি মৌন উত্তরণে,
অন্য নামে ডাক দিলে শাশ্বত মরণে।

তিন

কোনো কোনো দিনরাত্রি একান্তই যেতে চাই ভুলে,
নিতান্তই দগ্ধ করে পাখি ডাকা ভোরের আকাশ।
রুদ্ধ করে ভুলে যায় অসহায় পীড়িত হৃদয়,
নিবেদিত বৈরাগ্যেও রয়ে গেছে সীমার বিস্ময়।

চার

তোমাকে পাইনি তবু আরো তীব্র এষা,
অনাহত সুদূরের ধ্বনি নিরন্তর।
ডাক দেয় মিথ্যে মিথ্যে রঙ রূপ নেশা,
অথচ তুমিই রাখ নিজেকে আড়াল।

আমি তাই আজও শুধু ভিখারি কাঙাল।

মেঘ

অষ্টপদ মালিক

নীল আকাশে মেঘের ভেলা
বৃষ্টি চোখের কোণে
রাত বাড়ে ঘড়ির কাঁটায়
স্বপ্নেরা জাল বোনে।

স্বপ্নগুলো চোখের পাতায়
কাজল টেনে যায়
ভোর হলে মেঘছানারা
প্রভাতী গান গায়।

গানের সুরে মাতাল হাওয়া
জীবন ছবি আঁকে
ছবির খাতায় নীল স্বপ্ন
মেঘে ঢাকা থাকে।

মূল্যবোধ

শাওন ভট্টাচার্য

নতজানু হয়ে হারিয়ে চলেছি সব,
সম্মান, ভালোবাসা, কর্তব্য, অধিকার
যা বাকি ছিল,
কিন্তু কখনও জানতে চাওয়া হয়নি
কীসের জন্য এই পরিণতি?
শৃঙ্খলতার ভরাডুবি তো কবেই হয়ে গেছে
কবিরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্ত
আত্মসম্মানবোধ জন্ম নিয়েছে ঠিকই,
কাল হয়েছে মানসিকতা
দিন দিন যেন সেটা আরও পিছিয়ে যাচ্ছে
হলাহলে সমগ্র বিশ্বকে ধীরে ধীরে গিলে খাচ্ছে
আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় বলেই প্রভাবটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে টের পাচ্ছি
অজানা একটা ভয় মনের মধ্যে সর্বক্ষণ তান্ডব নৃত্য করে চলেছে
এগোতে এগোতে খাদে পড়তে চলেছ সমগ্র প্রজন্ম
হারিয়ে যেতে বসেছে স্বাধীন চিন্তা অভিনবত্বের ঝঙ্কার
মূল্যবোধ ছাড়া আবর্জনামুক্ত সমাজ কল্পনা করা সময়ের অপচয়।

ক্ষীণাশা

সুদীপ

ঠাণ্ডা কনকনে শীতেও জোনাকিরা আলো দেখাচ্ছে
একখানা শিশু ধর্ষিত মায়ের চিৎকারে চিৎ
আমরা ক্লান্ত। আমরা ভোগের দশায় নীরব।
কর্কশকণ্ঠী কুকুরের দল জাতীয় সড়কের উপর মানবতার গান শোনাচ্ছে
একখানা চাঁদ ভাগ হয়ে যায় কৃষ্ণপক্ষ আর ইদে
আমাদের শূন্যতা বিশাল আকাশের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে শূন্য কাকে খোঁজে
এক টুকরো বরফে ভেজে ফেসবুকীয় কবির ওয়াইন
এক বাক্স বরফে ঢাকা আছে প্রতিবাদী এক নারীর কফিন
বস্তাপচা কী প্রসঙ্গ? না বস্তাপচা আবেগ?
বস্তাপচা আজ বিপ্লবের ভাষ্য।
একরাশ বীর্য মাথায় নিয়ে খিলখিল করে হাসে আমাদের লড়ে যাওয়ার আশা।

কবিতার পটভূমি

রুদ্র সুশান্ত

তোমাকেই চাই, বহুবার জন্মানোর পরও আমি আগের মতোই।
দুধ দিয়ে ভাত খাই, হাত-পা-চোখ আছে সর্বাঙ্গে সবই।
তোমাকে ভালোবাসি, চিতার আগুনে পুড়ে আমি উড়ে উড়ে পৃথিবী ছেড়ে যাইনি,
তোমার নাকাগ্রে হেসে হেসে বসেছি বারংবার।
আমার বারবারের জন্ম ওটাই মনে করে দিয়েছে আবার।

সমুদ্রজলে আমার তেষ্টা মেটানোর ব্যর্থ চেষ্টা আমি করিনি,
পৃথিবীকে ঘর ভেবে তোমার ঠোঁটে আমার তিয়াস মিটেছে জন্মাবধি
ভালোবাসার দাবি নিয়ে আমি সেঁচে দিতে পারি মহাসমুদ্রের
জল অথবা জলময় করে দিতে পারি নদী।
তোমাকে ভালোবাসলে আমার আর ব্যর্থতা থাকে না,
না থাকে আমার মনের নগ্নতা।
কেন্দ্র থেকে তোমার পরাণে আমি বেঁধে দিতে পারি আজন্মকালের মিত্রতা।

তুমি কোন নারী নও, প্রেমিকা। তোমাকে ভালোবেসে আমি পবিত্র পাণ্ডুলিপির ভিখারী,
তুমি কবিতার আবাসভূমি।
আমার অনুভূতির দশ-ইন্দ্রিয়, সংসারি অথবা বৈরাগ্য ভাব,
সব তোমাকে সমর্পণ করে ধুলিমাখা পায়ে দিলাম যুগান্তরের চুমি।

শব্দের কথা

সৌম্য পাল

তোমরা কাছে যাবো ভেবেছিলাম,
কিন্তু যাওয়া তো হল না...
ঐ যে বৃষ্টি এলো ঝম্ ঝম্,
ধেয়ে এলো কেবল
অথৈ অন্ধকারের শব্দহীনতা
শুধু বলা হলো না, কোনো কথা!
একাকী দুলছে সাঁকোটা,
ঝড়ের অভিমুখে চলেছে মন,
চারিদিক শূণ্যতা—
গভীর গোপন নীরবতা।

প্রভাত আর সূর্য্যের প্রেম

মায়ারানী সাহা

শিশিরে ভেজা
সকালটার দিকে তাকিয়ে,
মনে হয় যে—
সদ্যগঙ্গা হতে স্নান করে।
ভেজা কাপড়ে প্রেমিকার সাথে
কথা বলতে বলতে।
নিজেকে ভুলে গেছে
তাই মাথার উপর দিয়ে
একটি দাঁড় কাক
তার ভুলের কথা
স্মরণ করিয়ে দিয়ে কা-কা করে
উড়ে চলে গেল।
দূর হতে বহুদূরে।
সূর্য্য ওঠে,
তার কদলী পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত
কোমল অংশের কিছুটা ভাগ।
দেখে সব ভুলে গেল
আর তার কপালে লাল রংঙের একটি টিপ
পরিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে
চলে গেল আকাশে
যেন কেউ তাকে ছুঁতে না পারে।
এমনিভাবে দিনের পর দিন
চলে তাদের অভিসার।
হিম শীতল বাতাস নিয়ে আসে সন্দেশ,
সূর্য্য উঠে চুমো দেয়
প্রভাতের গালে
তারপর সূর্য ধীরে ধীরে
আপন সিঁড়ি বেয়ে
চোরের মতো পালিয়ে
যায় উপরে।

বাড়ি ফেরা নয় আজ

জয়ন্তী দেবনাথ

সূর্য তখন ডুবতে বসেছে;
কথা রয়ে গেছে বাকি;
আলো আঁধারে পাশাপাশি বসে
খানিক পরেই সময়ের শেষে
দুই পথে যাবে দুইজন তাই
বাড়ি ফেরা নয় আজ।

জমেছে মেঘ ঈষান কোণে
চিবুক ভেজে আনমনে; নিশ্চুপ তাই
মৃদুমন্দ পানসা বাতাস
কালো হয়ে আসে নীলাভ আকাশ;
দুজনার মনেই হারাবার ভয় ....
হলুদ আলোয়; রুমালটি দেয় এগিয়ে।

সময়ের শেষে বাজে হুইসেল
প্ল্যাটফর্ম জুড়ে স্পেশাল ট্রেন;
সব ছেড়ে ; যেতে হবে সীমান্ত পাহারায়
সৈনিক যে সে; নিয়েছে মাতৃভূমি
রক্ষায় দায়
দুই পথে দুই জন; তাই
বাড়ি ফেরা নয় আজ।

(সৈনিকগণের পারিবারিক জীবন অবলম্বনে)

কোথায় পালাবে তুমি

তুহিন কুমার চন্দ

ঈশ্বর এখন নেমে এসেছে পাপস্খালনে
কচি বাঁশের মগডাল আর ধনুকের ছিলায় বসিয়েছেন ওঁম মন্ত্রোচ্চারণ।

কোথায় পালাবে আজ শকুনের দল,
ঈশ্বর তো জলেই ছিলেন,
কেন মিছে ঘুম থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করলে তাকে।

তুমি তো জানো না,
কোনদিক থেকে উড়ে আসবে অর্জুনের নির্ভুল অগ্নিফলাকা।
অসময়ে কেন তাকে টেনে নিয়ে এলে।

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, নিকশ অন্ধকারে
শুধু তার দুচোখে আগুন।
এবার দুঃশাসন কোথায় পালাবে তুমি।

ঈশ্বর তো জলেই ছিলেন, কেন তুমি বারবার আঘাত করেছো তাকে।
এখন কোথায় পালাবে তুমি,
চারদিকে আজ ব্রহ্ম নেমে আসে।
তোমার বর্ম চিরে রক্ত চুষে খাবে।
কোথায় পালাবে তুমি,
কোথায় পালাবে তুমি শকুনের দল!

পাড়ি

অম্বালিকা পালচৌধুরী

চাঁদ খেয়ে দেখেছিল পায়রাটি
অন্ধকারের সঙ্গে তার আড়ি চিরজন্মের

এক-দুই-তিন করতে করতে
সাত নম্বর ঘরে আসতে না আসতে
অজান্তে খসে গেল কাঁটাতার, পর্দা, খোলস, আগল।

পায়রাটির উঠোনে এখন জল থইথই
মাঝে গোলাকার জ্যোৎস্নামাখা
চাঁদ কিংবা চাঁদের মতো কিছু

পায়রাটি ভাবছে
আসন্ন পূর্ণিমায় এবার সে পাড়ি দেবে
মুথাডাঙার মাঠে।

নিষ্ঠা কোথায়

শান্তা কর রায়

মোহরগুলো কোথা থেকে এলো বলে যাই
সাপের মতো মেধায় ঢুকছিল মূর্ছিত মন্ত্রধ্বনি

একদা কবিতা অগ্নিকোণে ফিরছিল বাড়ি
তার নিজের ভাষায় ফিরছিল কিনা
জানার আগেই থেমেছিল

শেষদিনের কাজ ছিল অনুবাদ ঘিরে
পরজীবী আমি আমারই ভিতর উঠি আর বসি
বাঁশি বেজে বেজে ডেকে গেছে কতবার ঘুম ভাঙেনি
ঘুমের দেশে কোলাহল বলে গেছে
তেমনি আমার মতো গাছপালাদের জন্য
নতুন অভিধান কল্পনা করো
প্রস্তুতি নিচ্ছে স্বপ্নদ্রষ্টা আগুন
সৃষ্টির ব্ল্যাকহোলে জমা হবে নিরর্থক কাব্য
যদি খুলে দ্যাখো অথবা বোলাও হাত
অন্ধও দৃষ্টি ফিরে পাবে সন্ধের পরে

তারপর দ্বন্দ্বকিলবিল দুচোখের বিষ
ওরা লেনিন ভেঙেছিল।
সঠিক দৃষ্টি ফোকাস করে রাখো
আমারই অন্তঃস্থলে
দেখতে পাবে থরেবিথরে সাজান
চেতনার স্তর থেকে অবচেতনে শুধু
তোমরা আমাকে ভাঙো লেনিনের মতো
যেমন করে মন্দির, মসজিদ ভাঙো।

নৌকাযাত্রা

অরূপ পান্তী

মাঝে মাঝে মনে হয় ভেসে যাই
এক অলৌকিক নৌকায়
আকাশে অভিমানী চাঁদ আধো আলোয়
উত্তাল নদী পারাপার
একটু করে ডুবছি আবারো ভাসছি
স্থির হলে ভালোবাসছি
অনুভবে অনুভবে পুড়ে যাচ্ছি
দহন নীড়ে একা।

জলে লাগে ঢেউ, আগুনে লাগে হাওয়া
জল ছেড়ে উঠলেই আগুনে পোড়ে পাখা
মনের দহন মেটে একটি আগুন ভালোবাসা

মাঝে মাঝে মনে হয় যেন
রয়েছি এক অলৌকিক নৌকায়।।

বেদনার বিষণ্ণ নূপুর

কৌশিক দাস

ইস্পাতের মতো কঠিন হাড়ের বাঁধন আলগা হয়ে পড়েছে ....
বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে মেঘে ঢাকা কোমল হৃদয়ের তারা,
চারিদিকে কেবলই সারি সারি বেদনার্ত কান্নার মিছিল
নিবিড় স্নিগ্ধতা ঢেলেছে হাহাকার গভীর আঁধারে।
আমাদের দুঃখের পৃথিবীতে
কী করে তোমাদের জ্বলে শুভ্রতার দীপ?
রক্তে রাঙা মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপের সাথে বাজে শাঁখ কেন?
বঞ্চিত প্রাণের ব্যথা, বেদনার বিষণ্ণ নূপুর
সমাজের আধুনিক সভ্যতার অন্ধকারে হারিয়ে যায়,
শিশির ভেজা স্নিগ্ধ জোছনাময় বনভূমিতে
হারিয়ে গেছে মুঠো মুঠো ভালোবাসা
হয়তো মানবিকতার শুভবোধ
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
অনাথ ভাগ্যহীনরা চলেছে নিভৃতে কেঁদে
বিবর্ণ আকাশের বেদনার জলে,
নিরন্ন বালুকাবেলায় গভীর রহস্যে আছে
অবর্ণনীয় পুনর্জন্মের প্রতিক্ষায়।

তুমি আসবে বলে

লহরী (বড়াল) চক্রবর্তী

তুমি আসবে বলে সকাল থেকে
গোলাপের গুচ্ছ নিয়ে বারান্দাতে বসে আছি,
তুমি আসবে বলে সাতসকালে
গোলাপী শাড়ি পড়ে বিন্দি টিপে সেজে থাকি।
তুমি আসবে বলে স্মৃতির চাদর পেতে
মনের তানপুরাটা বেঁধে রাখি।
তুমি আসবে বলে দক্ষিণ জানলা খুলে
বাতাসের দোলায় হেসে উঠি।
তুমি আসবে বলে স্মৃতির ময়লা ভুলে
প্রেমের গানে মেতে উঠি,
তুমি আসবে বলে পূজার থালায়
ধূপ আর দীপ সাজিয়ে রাখি।

একটি ভ্রূণের আর্তি

শর্মিষ্ঠা ভৌমিক

মাতৃজঠরে কাঁদে তোর ভ্রূণ
কাঁটাগাছের বীজ দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ হয়ে
উপড়ে দেবে ক্ষতবিক্ষত করবে নবজাতকের নাড়ী
মাতৃজঠরই তার জগত ... অস্তিত্ব ... সুখনীড়...
পৃথিবীর রক্ত বড় কালো, বড় অপবিত্র এক নরককুন্ড
মানব পিশাচের তান্ডব নৃত্যে হয় পূজা ঈশ্বরের
নিত্য বলি হয় সেথা কন্যাশিশুর
তবেই হয় শান্ত মানব পিশাচের রক্তপিপাসু মন ...
সমতল দেখ কাঁপছে থরথর,
পর্বতের রুদ্ররোষ .... মরুপ্রান্তর সদাই বিধ্বস্ত বালুকা ঝড়ে
শান্তি কোথা মাগো?
বলে সবে—পশুকুল নাকি হিংস্র, নিষ্ঠুর বড় যে
লিঙ্গনির্ধারণ অভিশাপ সম তাদের সমাজও মানে
হায়রে মনুষ্যসমাজ
প্রাণ যদি যাবে যাক এখনই—তোরই জঠরে
কবে না কেহ বন্ধ্যা তোরে।
তোর জঠর মোর ক্রোড়সম
এই সীমিত সুখে মরণেও যে কি সুখ
কর আমাকে মুক্ত, কর নিজেকে উন্মুক্ত
ধিক্কার জগতেরে
লিঙ্গভেদের মায়াজালে হয়ে আকৃষ্ট
করে চলেছিস শক্তির অবমাননা
আসবে খরা, দুর্ভিক্ষ, ভূকম্প
নিমেষে সব ধুলাগড়ের রাজা।

একদিন কন্যাভ্রূণে করবে সবে শত হস্তে কুর্নিশ
তবে কবে আসবে সে দিন বড় তা অনিশ্চিত!
তারই মাঝে উঠবে গড়ে মানবিকতার প্রাসাদ....
প্রার্থনা তাই কন্যা ভ্রূণের স্বয়ংসিদ্ধা হওয়ার।

একাকার

অভিষেক দাস

জ্ঞান যেথা কৃষ্ণময়
ধ্যান সেথা মগ্ন হয়
সংকীর্ণতা যদি সমৃদ্ধ হয়
দূরত্বটা বেড়ে যায়।
ব্রহ্ম যেথা শ্যামময়
দীপ্ত করে মন
শব্দ যে হয় অর্থহীন
সন্নিকটে আপন।।

ধূপছায়া

রঞ্জিতকুমার ভরদ্বাজ

মোবাইলে সাড়া না পেয়ে বিপ্রলব্ধ যুবক
হতাশ চিত্তে ভাবে এ কী লুকোচুরি খেলা সুন্দরীর।
কী জানি কী আছে তাহার মনে।
অর্ধনগ্ন নারী এক তখন পথের পাশে, অদূরে
খুঁজছিল খাদ্যকণা অধীর আগ্রহে আঁস্তাকুড়ে
কোলে অপুষ্ট শিশু, মুখে শুষ্ক স্তন জননীর।
মায়াবী আলোয় রেস্তোঁরায় একান্তে যখন
সাবলীল হাসির ছন্দে স্বপ্নরচনায় মগ্ন
স্বচ্ছল যুবক যুবতী
সন্ধ্যার বাতাসে তখন ঘরমুখো মানুষের গুঞ্জন,
হকারের আবেদন, ভিক্ষুকের আকুলতা ....
জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত নর্দমার দুর্গন্ধে, কর্দমে
মিশে যায় শহুরে সুগন্ধি, ফ্লুরোসেন্ট চ্ছটা,
রিক্ততা ও উদ্বৃত্তে, আর্তি ও ফাঁপানো আবেগে,
সুষমা আর কদর্যতায়
ঝলকায়, চলকায় নির্বিকার নাগরিক সভ্যতা।

অহং

শিবশঙ্কর বক্সী

আকাশের কাছে আমি
ঘন কালো মেঘ চেয়েছিলাম,
পেলাম কাঠ ফাটা রোদ্দুর।
ভেবেছিলাম অঝোর ধারায় ভিজবো
তৃপ্ত হবে, জুড়াবে শরীর।

আকাশের কাছে আমি,
চাঁদের স্নিগ্ধ আলো চেয়েছিলাম,
পেলাম তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার।
ভেবেছিলাম স্নিগ্ধ-নরম আলোয়,
মন সতেজ হয়ে উঠবে আবার।

আকাশের কাছে আমি,
মিষ্টি মৃদু-মন্দ বাতাস চেয়েছিলাম,
পেলাম গুমোট অস্থির গরম।
ভেবেছিলাম মিষ্টি হাওয়ায়
শ্বাস নিয়ে মনটা হবে শীতল নরম।
আকাশের কাছে আমি,
তোমার অস্তিত্ব চেয়েছিলাম,
পেলাম বুক ফাটানো হাহাকার।
ভেবেছিলাম তোমার মাঝেই
খুঁজে পাবো আমার অহংকার।

পাল্টে যাচ্ছে সময়

তাপসী আচার্য

রোদ চশমায় ছায়া পড়েছে উঁচু উঁচু রেসিডেন্সির
পাল্টে যাচ্ছে চেনা-জানা রাস্তাগুলোর নাম
এইতো সেদিনও চেনা ছিল অলিগলি—
চোর চোর খেলেছি কত,
চোখ বন্ধ করে খুঁজে পাওয়া যেত বন্ধুকে
আজ খোলা চোখেও খুঁজে পাওয়া দায়
যাকে ধরবে ভাবছো, সে পরেছে মুখোশ,
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অসাড়, সাবধানে এগোও নবীন বন্ধু।

ছুটছে সময় ছুটছে শৈশব-যৌবন
সব কিছু জায়গা বদল করছে, তাগিদ তাগিদ
পচা জলাশয় ফুঁড়ে ঝলমলে শপিংমল!
পাল্টাচ্ছে নন্দন-একাডেমি চত্বর, নতুন মুখ নতুন প্রেম
ঝকঝকে কফিহাউস—চেনা চেয়ারে অচেনা মুখ!
বাঙালি খাবার! সুতলি-দড়িতে ঢলঢলে পাজামার রেসিপি;
তার চেয়ে ফিসফ্রাই, চিকেন মোমো কিংবা গ্যাদগ্যাদে গ্রেভি চাউমি।

অন্য সুরে বইছে রবিঠাকুরের পাগল হাওয়া
কাঁকড়ার ঊর্ধ্বগতি, টেনে ধরো, হুড়হুড়িয়ে পড়বে!
বদলাচ্ছে জায়গা, বদলাচ্ছে প্রজন্ম, নাকি বদল হচ্ছে মন-মনন?
আজ চেনা শহরটাই সমুদ্র সফেনের মতো অচেনা বড়ো!

প্রাচীনত্বের ঘষা চশমাটা চোখে এখনো প্রবীণ
ওটা বদলাও, বড্ড সেকেলে, নতুন কে করো আহ্বান
তাল মেলাও, দেখবে তোমার আরাম কেদারার মতো
সব ইজি, ঝাক্কাস্, ফার্স্ট ফুট, ফার্স্ট লাইফ।

কত সামান্য

পলি ঘোষ

জমেছে আমার বুকের ভেতর আজ পলি।
পলি পড়ে পড়ে বুকের ভিতরটা এক্কেবারেই
শিথিল হয়ে গেছে। শিথিল হতে হতে
দমকা হাওয়ার বেগে কখন পালিয়ে গেছে
আঘাতের ক্ষতচিহ্ন। এখন সেখানে বাসা বেঁধেছে
অগ্রগতির পথ নিদর্শন।
এখন সে এগিয়ে যায় দুরন্ত ট্রেনের গতিতে।
আজ তাঁর কাছে সবই সামান্য। কোনো কিছু
বাধাই সে মানে না। সে আজ হয়েছে রানার।
রানার যেমন তার চলন্তগতিকে কোনোভাবেই
থামিয়ে রাখে না, আজ সেও কোনোভাবেই থেমে থাকেনি
সে আজ প্রতিবাদী আগুনের শিখার মতো
ঝড়, বৃষ্টি, সূর্যের প্রখর তাপে
সে আজ এগিয়ে চলে অগ্নিশিখার গতিতে
চলন্ত পথে অনেক বাধা অতিক্রম করে আজ
সে নিজের পরিচয় নিজেই ছড়িয়ে দিতে চায়
আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনির মতো।
হয়ে উঠেছে অগ্নিশিখা।

ক্ষত

সুদীপা মজুমদার

লিখি লিখি করি তবু লেখা হয় না
এতো তারে ডাকি তবু সাড়া দেয় না,
আকাশ ঘন নীল হয়ে যায় রাত্রি নামে পাটে
মনের কপাট খুলে আজও নিশীথ রাত্রি কাটে,
বৃষ্টিস্নাত শরীর জুড়ে তোমার অনুভূতি
তন্দ্রা গহন চোখের তারায় তোমার উপস্থিতি,
সাগরের জল স্পর্শ করে আমার অন্তঃস্থল
শরীর জুড়ে গভীর ক্ষত ফেলছে নোনা জল।।

সহযাত্রী

ভীম ঘোষ

কোনো এক বোধ তোমাকে আঁকড়ে ধরেছে,
আষ্টে পৃষ্ঠে বন্ধনে।
নৈঋত দৃষ্টিতে, বৃষ্টিপাতে ভিজছ।
শরীরে হয়তো, কিছুটা আগুন আছে।
রক্তের ঢেউয়ে ভাসছ, অজানা স্বপ্নে।
ঐ দূরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে রামধনু।
বুকে জমেছে বেদনার পাহাড় মন্দ হাসিতে।
বিদায় নেবে, কোন স্বাদে ডুবে আছ এখন।
পিছন থেকে, কে যেন, টেনে নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে।
এক চোখে দেখছ শূন্যতা, আর অন্য চোখে জ্বলছে আগুন।
হাঁটু জলে কেটে যাচ্ছে রাত, কলঙ্কিত দেহে।
একাকি জীবনযাপন, যন্ত্রণায় কালসিটে দাগ ত্বকে।
অতি সহজে বলতে পার, তুমি এখন মৃত্যু সহযাত্রী।

সব হয় ছাই

দেব দত্ত

বৃথা এ পৃথ্বীর আশা মিথ্যা সে যাওয়া আসা
ব্যথায় ভরে ও কেহ ব্যবধানে শব দেহ
নীরব মনেতে সব ছাই হয় ভালোবাসা।
বৃথা এ পৃথ্বীর আশা মিথ্যা সে যাওয়া আসা.....
ভোগবাদ যোগ করি বিয়োগে ত্যাগের তরী
নিয়োগে প্রয়োগে প্রণাম
ও দয়াল তুমি কোথা শোনো প্রেম শোনো কথা
ষড়রিপু খেলে অবিরাম
বৃথা এ পৃথ্বীর আশা মিথ্যা সে যাওয়া আসা ....
তাইতো তোমারে স্মরি ভুল দোষ গড় করি
ক্ষমা করি দাও ও চরণ
বিধাতার কোল ছেড়ে বিধির বিধান কেড়ে
দেহ বাসে হয়েছে মরণ
বৃথা এ পৃথ্বীর আশা মিথ্যা সে যাওয়া আসা....

মনের সাজঘর

গীতশ্রী সাহা

বলেছিলে তুমি—পাল্টাব না নিজেকে।
কি হবে ভালো সেজে, অযথা রঙের পরত লেপে?
ভালোর মুখোশধারী দেখলাম কত,
হৃদয়ে ভরা হলাহল, মুখে সুমধুর ভাষণ যত।
তার চেয়ে, এই বেশ আছি ভালো,
তাতে কার কিবা এলো গেল।
কথাগুলো বড় ভাবায়,
অন্তরে অন্তরে বড় কাঁদায়।

মনে পড়ে বহু পুরাতন কিছু
অতীত স্মৃতির কথা,
সময়ের ভার জমেছে অনেক
মলিন ধুলো যেথা।
অতীত খুঁড়ে বেরিয়ে এল
মুখোশধারী কিছু মুখ,
যারা নিজ মুখে মধুর বাণী লেপে
কেড়েছিল সব সুখ।
তাই বয়েছি বৈঠা একাকি
লইনি কাউকে সনে।
জীবনের তরী, দিতে হবে পাড়ি
যদি কেউ না থাকে রণে।
তাই বললাম তোমায়,
—শোনো, শত ভুলের মাঝে
কত মানুষ কত যে সাজ সাজে,
তারই মাঝে তুমি না হয় আটপৌরে হয়ে।
এমনিই থেকো, মনকে রেখো
অন্তরে-বাহিরে
একই সুর গেয়ে।

অচেনা দিক

শুভদীপ সেন

নতুন চাঁদ পোশাক কিনছে বেশ।
নতুন বেশ চাঁদ কিনছে তিন।
সুরের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে রেশ
বিজ্ঞাপনে সিনেমার লাস্ট সিন।

রজঃস্বলা সেই গ্রহাণু খসার ভোরে
থেমে যায় শোক, নীলডাউন হয় ন্যাপি
আর্যসমাজ নীলচাষী 'র ঐ ঘরে ....
থিয়েটার করে সারা জীবনব্যাপী

যে খোলে খুলুক ; অন্ধের রঙ বাদামী।
অনেক কষ্ট পেয়েছে হাইওয়ে আর ব্রিজে
বিপদ বুঝে মাঝ রাস্তায় নামি —
ট্রাফিক থামবে, সস্তা কেবিন খুঁজে।

পায়ে প্রতিদিন শকুনির চাল চালি
কাকিমা এবার কটনশার্ট 'ই দেবে ...
শব্দজব্দ খেলতে বসবো কালই।
অতীত তোমার নাবালক কবে হবে?

মরণ জয়ের টিকা
শ্যামসুন্দর বসু

তপ্ত নিদাঘে বেজে উঠে প্রলয়ের বাঁশী
গুরু গুরু গর্জনে ধরিত্রী হয় কম্পমান
ডমরু হাতে সংহার মূর্তিতে আবির্ভাব
পিঙ্গলকেশী জটাজুটধারী রুদ্র দেবতা।
হতচকিত স্তম্ভিত বিশ্বজগৎ
ঘুচে যায়
বিভেদ, বিচ্ছেদ, কালিমা
জেগে উঠে নব প্রাণ।
শান্তির প্রলেপ লাগে সবার মনে
ছন্দময় সুরের তালে তালে
ফুটে উঠে জীবনের কোরকগুলি
বেজে উঠে সামগান...
সূর্যের আলোকশিখা
সবার ললাটে এঁকে দেয়
মরণ জয়ের টিকা।

এক কথায়
বঙ্কিমকুমার বর্মন

তুমি বলাতেই এক কথায় রাজি ছিলাম
নিঃশব্দে পায়ে পা মিলিয়ে হেঁটে গেছি
আম জামরুল কাঁঠাল মহুয়া বন ... পেরিয়ে
যেখানে একাত্ম হয়েছে পৃথিবীর পথ
তবুও, তুমি একাত্ম হতে পারনি
প্রতিদিনের ব্যয় জীবন-যাপনে
আর পড়ন্ত বিকেলের রোদ্দুরের সংস্পর্শে
আমি শুধু তোমাকে দেখেছি
তোমার এক কথায় পৃথিবীর শামুকের গতি....।

আমায় ভিজিয়ে দে বৃষ্টি
সুপ্রিয়া চক্রবর্তী

ও বৃষ্টি তুই সবুজ শ্যামল বেশে
ঘুম ভাঙালি সকাল বেলায় এসে
বৃষ্টি ধারায় আমায় ভালোবেসে।

বৃষ্টি তোর চপল নূপুর ধ্বনি
আমি চোখ বুজে যে শুনি
আমার জুড়ায় হৃদয়খানি সুখপাশে।

বৃষ্টি তোর স্নিগ্ধ বাদল ধারায়
মন যে আমার মাতাল করে হাওয়ায়
আনমনে সে কোন সুদূরে হারায়।

ও বৃষ্টি তুই আমার অনুভবে
আমার হৃদয় মধুর করিস তবে
আমায় শীতল করিস, তোরই জল রবে।

ও বৃষ্টি তোর রিমঝিম ঐ ধারায়
মন যে আমার মাতায়, ভালোবাসায়
আমি হারাই নিজেই, হারাই বারিধারায়।

ও বৃষ্টি তুই যাস না মেঘের দেশে
থাকিস আমার জানালাতে চুপটি করে বসে
আমি রাখবো তোকে অনেক ভালোবেসে।

হৃদয় অবাধ্য কবি

মানিকচন্দ্র কর্মকার

হৃদয় অবাধ্য কবিদের দল বসে আছে
রাত্রির ভিজে ঘাসে, কারো মাথায় টাক
কারো মাথায় কাঁচা পাকা চুল গোঁফ দাড়ি
কারো মাথায় আবার তালপাতার টুপি
কেউ কেউ আবার তরুণ, পরকালের প্রতিভু।
নির্জন আকাশে একফালি চাঁদ, দূরে
বহুদূরের তারাগুলি মিটি মিটি চায়
কবিদের সভা বলে কথা, তারা শান্ত অথচ
বুকের ভিতর ভলকানো লাভা, আগুন!
এই আগুন দিয়ে কি হবে কেউ জানে না।
শুধু কবিরাই জানে। এক যুগকে পিছনে ফেলে
তারা সামনের যুগে ঢুকে পড়ে, যেন ত্রিকালজ্ঞ।
বর্তমানের আগুন ঝরানো যুগের কবিদল,
কবিরা বোঝে সব কিছু, মিথ ভাঙে, মিথ গড়ে।
এরা দাম্ভিক, নির্ভিক জেদি কবি, তাই সভা।
হৃদয়কে এখনো বন্ধক দেয়নি, দেবেও না
সংসার ফেলে রেখে পাগল কবিদের দল
আজ এখানে একত্রিত, কিন্তু কেন? কেননা
এ যুগ রাক্ষস খোক্কস যুগ।
মৌনতা ভেঙে কবিতা পড়ে, চারপাশে আগুন বলাকা।

আলো যার নিত্য সঙ্গী

অমরকুমার দাস

তোমাকে ভাঙতে চেয়েছে
অন্যমনা অরণ্য বিস্ময়
আলোর পথে খানাখন্দ
কল্পিত প্রশ্রয়
জীবন পথের খোল নোলচে
বদলে দিতে চায়
বিচিত্র লোক গাথায়

তাদের মনের ভেতর ঘরে
নানান রকম কথা
কিছুটা তার গোপন রাখে
কিছুবা মুখে মুখে

চোখে চোখে অনেক বিজন বিদ্রূপ
শোভন বিসর্জন
তবুও—
আলো যার নিত্য সঙ্গী
ভয় করে না তার
মাটির বুকে হাজার বাতি—
সঙ্গী এখন—
সেটাই তোমার চলার পথে
সূক্ষ্ম পুরস্কার

ভুল

কিশলয় গুপ্ত

মেয়েটা যেই ফুল ছিঁড়েছে চোখ গিয়েছে মেঘে—
সিন্দুকের ওই শক্ত তালায় ছদ্মবেশী মরচে,
সদ্য মেয়ে, পদ্ম মেয়ে ঠিক চেনে না সর্ষে ;
পায়ের নীচে পথ বিছিয়ে হাওয়া জাপটে ধরছে।

দরকষা আর দরকচাতে মাংস এখন ক্লান্ত—
সময়-বড় নির্দয়, তাকে লোফালুফি করছে ....

মন চায়

আনিসুর রহমান খান

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
পাহাড় বেয়ে ঝর্ণা ঝরে
আয় চলে আয় মোহনপুরে
কে যেন আজ ছন্দ সুরে
নাচে ঘুঙুর পায়।

মন হয়ে যায় ফড়িংডানা
উড়ে উড়ে ভুবন জানা
মেঘ পরীদের দেশে যেতে
কেউকাড়াঢং পাহাড় পেতে
কার না মনে চায়!

জীবন পথ

দেবাশীষ অধিকারী

জীবনের পথে চলতে গেলে,
বিঁধবে পায়ে কাঁটা,
মনে রেখো জীবনটা নয়,
গোলাপ-চাদরে হাঁটা।
বলি তাই চিনতে শেখো,
জীবন পথের দিশা,
সঙ্গে যদি চেষ্টা থাকে,
কেটে যাবে ঘোর নিশা।
প্রেমের মধু বিলিয়ে দিও,
বিশ্ব-মানব মাঝে
জীবনটাকে জয় করার
শত রাস্তা আছে।

কবি নির্বাচন

মৃন্ময় বসু রায় চৌধুরী

গল্প বলি নতুন এক,
কবি নির্বাচন
সভাগৃহে পূর্ণ
সব গুণীর আসন।
শুরু থেকে প্রায় শেষ,
কতই কাব্য রেশ
নতুন কবি বিরাজমান,
ডাক এল অবশেষ।
অপেক্ষমান দু-চারজন
অধিকাংশই খালি,
নতুন কবি বলেই চলে,
পরোয়া নেই তালি।
একের পর এক পংক্তি বলে
কি তার ক্ষুরধার
যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ান,
যারা ছিলেন চারিধার।
কখন জানি শেষ হয়ে যায়,
সবার অলক্ষ্যে,
সবাই তখন বেদনা বিদুর
আপন হৃদ কক্ষে।
একটির পর আরেকটি
কোলাহলের ঝড়
হোক না আরও... মিনতি সবার
হে কবিবর!
শ্রদ্ধাভরে কবি কহেন,
আপনারাই গুণীজন
ভালোবাসি কবিতা কেবল,
নাইবা হলেম নির্বাচন।

বরষার আগমনে
সাহেব মণ্ডল

ওই শোনো ঘনঘন, গুরুগুরু গম্ভীর
বাজে কার দুন্দুভি? কোন সে মহান-বীর?
গ্রাস করে দাবদাহ, খুলে মহা-জটাভার,
নিশুতি রাতের মতো ঢেকে দিয়ে চারিধার।
ঝলমলে পরিবেশ ধোঁয়া করে পলকে,
উড়িয়ে পথের ধুলো কোথা থেকে এলো কে?
বজ্রের তলোয়ারে ফালা-ফালা অম্বর,
ঝরে পড়ে ঝলকানি কাঁপে পাড়া, প্রান্তর
ঝড়ো হাওয়া বেগে বয়, পাল ছিঁড়ে বারবার...
হারিয়েছে মাঝি পথ, উত্তাল পারাবার।
দোলা লাগে বনে বনে ডাল ভাঙে দুড়-দাড়,
বিচলিত বিহগের ভয় বাসা হারাবার।
মেঘ-ভাঙা বারিধারে শুকা-মন কাদা ক'রে,
শার্সিতে মাথা মুড়ে চাষীভাই হাল ধরে।
ঝড়-জল দুর্যোগে কেউ হাসে, কেউ ভাসে!
তবুও তো বাঁচে ধরা-বৃষ্টিকে ভালোবেসে।

ভয় নেই ভয় নেই। বরষার আগমনে
বাহিরের আঙিনায় ভিজে দ্যাখো আনমনে,
টুপ-টাপ জলকণা ছুঁয়ে দিলে গভীরতা—
পাথরেও জাগে প্রাণ, ধুয়ে যত মলিনতা।

পাগলা কেতোর ছড়া
কার্তিক পাত্র

পাগলা কেতোর ছড়া
পাঠ করলেই উঠবে নেচে
পক্ষিরাজের বাচ্চা ঘোড়া
ভীষণ বেগে ছুটতে ছুটতে
বেল তলাতে আসবে ন্যাড়া।
পাগলা কেতোর ছড়া
নাম শুনলেই উঠবে হেসে
ক্যাওড়া তলার ঘাটের মড়া
চুপটি করে বসবে পাশে
পান্থ ভূতের জ্যান্ত ছোঁড়া।
পাগলা কেতোর ছড়া
হাসির খোরাক জোগান দেবে
পড়বে যে সব সর্বহারা
এইখানেতে আসবে যারা
নাইকো তাদের কাজের তাড়া।

বোঝা দারুণ শক্ত

গোপালচন্দ্র মণ্ডল

সবাই এখন কেমন আছে বোঝা দারুণ শক্ত
কেউবা বলে, যাচ্ছে কেটে বেরোচ্ছে না রক্ত।
কেউ বলে, শুধু বেঁচেই আছি না মরে যে ভাই
যাকে আমি জিগ্যেস করি উত্তর এটা পাই।

সব সময়ে সবাই থাকে মুখটা করে হাঁড়ি
নকল হাসতে তাদের বেরোয় দাঁতের মাড়ি।
সবাই এখন দিশাহারা নেই তো কারও সুখ
দেখে সবই যায় যে বোঝা তাদের করুণ মুখ।

আনন্দেতে প্রাণ খুলে তাই হাসে না কেউ আর
যে যার থাকে নিজের মতো মুখটা করেই ভার।
চলার গতি ঠিক না বেঠিক যে বোঝে আজকাল
তার কাছেতে বদলিয়ে যায় এই দুনিয়ার হাল।

(এই লেখাটি জমা দেওয়ার কয়েক দিন পর প্রয়াত হন কবি গোপালচন্দ্র মণ্ডল (৫.৭.২০১৮) বিকাল ৪.১৫ মিনিট নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত তাঁর অকাল প্রয়াণ হয়। ১৯৫৮ সালে শালকিয়ার ঘুসুড়ি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। মহামানব বিদ্যামন্দির স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর নরসিংহ দত্ত কলেজে তাঁর পড়াশোনা শেষ করেন। 'কৃশানু' সহ বহু পত্র-পত্রিকায় তার নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হ'ত। তাঁর নিজের তিনটি ছড়া ও কবিতার বই আছে। তাঁর তিন পুত্র কন্যা ও স্ত্রী এবং মা বর্তমান।)

সেই দিনগুলি

পথিক মণ্ডল

ডাকে সেই ছেলেবেলা সেই যে খেলার মাঠ
কী মধুর ছিল দিন শান্ত পুকুর ঘাট।
ডাকে সেই দিনগুলি সেই যে নদীর বাঁকে
কত খেলা জলকেলী মন শুধু ছবি আঁকে।
কোথায় হারালো সেই মাঠ-ঘাট-চেনা নদী
ঝাপ্‌সা চোখেতে ভাবি, দিনগুলি আসে যদি!

ভেজাল

শিল্পী হালদার

সব ঋতুতেই সব পাওয়া যায়
আমরা মরছি বিষের জ্বালায়।
ভাত খাবে কম, ওষুধের চাল,
ফল খাবে ভাই? তাতেও ভেজাল।
তরমুজে শুধু লাল রং নয় সেকারিনও যোগ রয়
আম, কাঁঠাল আর কলা, বেল সবই কারবাইটে পাকা হয়।
মাছের তেলে মাছ ভাজা হয় প্রবাদেও তা আছে।
তেলে ভেজাল সবাই জানি শিয়ালকাঁটা গাছে।
বিজ্ঞাপনের খাবার খুঁজি বাজারে গিয়ে সবাই।
বাড়ন্ত বাচ্চার ছবি দেখে দেখে মুগ্ধ চোখেতে চাই।
গুল্লু গুল্লু বাচ্চা দেখলেই বেশি আদর করি।
রোগা হলেও সুস্থ থাক এ কথাটা না স্মরি।

আলোর বেণু

মানস চক্রবর্তী

শরৎ এসে - মিষ্টি হেসে
ছড়িয়ে দিলো আলো,
আকাশ জুড়ে ঝলমলে রোদ
লাগছে সবই ভালো।

মন উড়ে যায় মেঘের দেশে
হৃদয় পাগলপারা,
উঠলো বেজে আলোর বেণু
সবাই আত্মহারা।

শিশিরকণা ছড়িয়ে দিলো
মুক্তোঝরা হাসি,
উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে আছে
শিউলী রাশি-রাশি।

পদ্ম-শালুক ফুটে আছে
শান্ত দীঘির জলে,
লাগলো দোলা কাশের বনে
খুশির কোলাহলে।

আজব দেশে-আজব বেশে

মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদ নিজেকে চাঁদ বলে না
সূর্যও কি বলে?
নিজের নামে ঢাক পেটানো
সত্যি করে চলে!

কবিও দেখি বলছে কবি
ছড়াকারও তাই
পাঠক তবে কি আর বলে
ভাবছি বসে ভাই।

নেতাও দেখি নিজের নামে
পেটায় ঢাকঢোল
জনগণও বলে তখন
কর না হরিবোল।

মাতাল কেবল নিজে বলে
মাতাল আমি নই
মাল টানলেও সদা আমি
তালেতে ঠিক রই।

জন্মেই তাই বলছে শিশু
শিশু কোথায় পাই?
শৈশব আজ হারিয়ে গেছে
রূপকথাতে নাই।

এখন দেখি সব গাছেতে
যাই ফলছে পাকা
গর্ভ থেকে পড়ার পরে
সেও খুঁজছে টাকা।

আজব দেশে আজব বেশে
করছি সদা বাস
সোনার ডিমের গল্প শুনে
মেরেই ফেলি হাঁস।

দাও ছেড়ে - আসুক মেরে

রবিনকুমার দাস

তুই কি উমা, তুই কি শ্যামা, তুই কি ধূমাবতী
তুই কি রে মা অকালবোধন, তুই কিরে মা সতী।
তুই কিরে মা প্রতীক চিহ্ন, দূর্গতিনাশিনী,
তুই কি রে মা দশভূজা, মহিষমর্দিনী।

তুই কি রে মা নারীশক্তি প্রকাশ অবিরত
তোর হাতে তো অস্ত্র আছে হোস কেন মা নত!
তুই তো অসুর মেরেই মহান জগৎ জোড়া নাম
মর্তে ওদের মারতে কেন ঝরে পড়ে ঘাম?

সর্বশক্তিমান হে তুমি, সর্বশক্তিমান
নারীকে মা রক্ষা করতে চালাও অভিযান,
একলা যদি না পারো মা সিংহকে দাও ছেড়ে
অসুর নিধন যজ্ঞে নেমে বাহন আসুক মেরে।

শান্তি ফিরুক দেশে দেশে চাও না কি মা তুমি
নারীজাতির অবক্ষয়ে কাঁপবে কেন ভূমি,
ঠাকুর মানে আমরা জানি অশেষ ক্ষমতা
ওই পাপীদের খতম করতে কিসের মমতা?

ফুসকুরি

শূলপাণি শর্মা

।। ১।।
সঙ্গে থাকুন
রঙ্গে থাকুন
বঙ্গে থাকুন
ভঙ্গে থাকুন
কোথাও না থাকুন
ছবিতে থাকুন!

।। ২।।
বালিকা বধূ
সেকেলে সাজ
বালিকা মাতা
কেলোর কাজ!

।। ৩।।
সব পাখি ঘরে আসে
সব নদী
ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন
সব নোট ফিরে আসে
সব কালো
ফুরায় না রাজনীতি যত কথা সফেন!

।। ৪।।
ভোটের অনুপ্রবেশ
স্বাগত
ভাগের অনুপ্রবেশ
ভাগো তো!

।। ৫।।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ
তবু রঙ্গে ভরা
ডেঙ্গিভূমি সঙ্গী তুমি
তুমি বসুন্ধরা!

।। ৬।।
'শাসকের লাঠি
পুলিশের হাতে'
না হলে পুলিশ
মারা যাবে ভাতে!

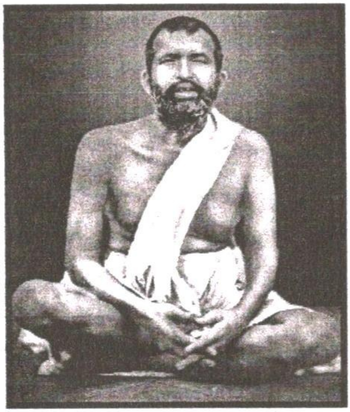
।। ৭।।
'উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে
রাস্তায়'
মনোনয়ন এগোতে গিয়ে
পস্তায়!

।। ৮।।
কষ্ট হলে
দেখেন কেষ্ট
ভোট শিকারে
তিনিই শ্রেষ্ঠ!

।। ৯।।
হোক আলিঙ্গন
হোক ধোলাই
হোক বিপণন
হোক চোলাই
থাক্ ধর্ম
থাক জিরাফ
যাক অসুখ
খাক সিরাপ!

।। ১০।।
বিদ্যুতে হুকিং
এটি এমে হ্যাকিং
কারও কাছে শপিং
কারও কাছে শকিং!

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :



হাওড়া সন্ধানি শিল্পী গোষ্ঠী

(পঃ বঃ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার-সঙ্গীত নাটক বিভাগ
কর্তৃক অনুমোদিত নাট্যদল)

১৮/২, শোভান চৌধুরী লেন, সালকিয়া
হাওড়া - ৭১১১০৬ (পঃ বঃ)
ফোন : (০৩৩) ২৬৫৫ ৩৯৭৫, চলভাষ : ৯৪৩২৪৯৪২০৯
E-mail : amitavaganguly80@gmail.com/
sandhanishilpigosthi@gmail.com

ভক্তিমূলক, সামাজিক, গীতিআলেখ্য, শ্রুতিনাটক,
নৃত্যনাট্য ও নাটক পরিবেশক

যোগাযোগ : **শ্রীঅমিতাভ গাঙ্গুলী**

অভিনয় ইচ্ছুক পুরুষ, মহিলা, শিশু কিশোররা যোগাযোগ করুন।

নির্যাতিতা

মনন দাস

আষাঢ় মাস। আজ দশহরা। জানালায় দাঁড়িয়ে সর্বানন্দ। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত গঙ্গাবক্ষে। প্রবাহিনী মা গঙ্গা। আজ গঙ্গাপূজা। আকাশে শ্যামল মেঘ সঞ্চার। আকাশ জুড়ে মেঘ যেন মায়ের মতো অবনত—বিশ্বসন্তানকে পান করাতে অমৃতধারা। এওতো মায়ের এক রূপ। একজন ভক্ত তাঁকে গতকাল প্রশ্ন করেছিলেন—এই যে মাতৃপ্রতিমা কালী—এই বর্তমান রূপ ঠিক কবে থেকে পূজিত হচ্ছে? তিনি একটু ভেবে বললেন—মায়ের কি ইতিহাস আছে ভাই! ভক্ত তাঁর মনের ইচ্ছায় প্রতিমার রূপ দেয়। হয়ত কেউ এই রূপ কল্পনা করেছিল, সেটা ক্রমশঃ সকলের মনে ধরেছে। আজ তুমিও তোমার মনের মতো একটি প্রতিমা গড়ে পুজো করতে পার। কোথাও তো একখণ্ড প্রস্তরও মাতৃরূপে পূজা হয়, বা একটি জলধারা। সেদিন দেখি মন্দিরের পিছনের বাগানে একটি কলার কাঁদি নেমেছে, অবনত কাঁদিটির উপর একটি বড় পাতা নুয়ে আছে ঘোমটার মতো। আবার ছোট মোচাটি কাঁদির মুখে—যেন অলঙ্কার। এত ভাল লাগছে দেখতে! গাছটি যেন মায়ের এক রূপ! আবার দেখ—বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে যখন ঢেউ দিয়ে যায় বাতাস—সেও তো মায়ের আরেক রূপ!

গতকাল থেকে মন বড় বিষন্ন হয়ে আছে। মাসে একদিন তিনি নাটমন্দিরে ভক্ত সমাগমে আলোচনায় বসেন। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংসারে মানুষ আনন্দের চেয়ে দুঃখকষ্টই পায় বেশী। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। সব সময় যে সক্ষম হন তা নয়, সে ক্ষেত্রে তিনি জানিয়ে দেন অক্ষমতার কথা, আবার কখনও বলেন—ভেবে বলব পরের বার।

তিনি কাউকে তুই বলে সম্বোধন করেন না। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ, নিয়ম শৃঙ্খলায় বাঁধা জীবন তাঁর চেহারায় আরো উজ্জ্বলতা দিয়েছে। তাঁকে দেখে সৌম্য সুন্দর যুবক বলেই মনে হয়। তিনি সকলকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করেন, বয়স অনুযায়ী তুমি বা আপনি বলেন এবং মহিলাদের সকলকেই মা বলেন।

গতকাল থেকে মন বড় বিষন্ন হয়ে আছে। একজন বয়স্ক মানুষ প্রশ্ন করেছিলেন—চারিদিকে এখন এই যে নারী নির্যাতন এ কি বন্ধ হবে না? এর কি কোনো প্রতিকার নেই? এ কি দিনকাল এল?

এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে নিজেকে বড় অশুচি মনে হয়। তাছাড়া এই

করুণ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে বড় ব্যথা লাগে মনে, তবু বলতেই হয়। তিনি বলেছিলেন—চিন্তায় বাধা পড়ল তাঁর—কে ওখানে?

—বাবা, কিছু ফলমূল এনেছি, আজ দশহরা, মন্দিরে দেখলাম কেউ নেই তাই আপনার ঘরে এলাম, অপনি নিজহাতে গ্রহণ করলে—জনৈকা বৃদ্ধা, কথা শেষ না করে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

—দিন মা, —হাত বাড়িয়ে নিলেন সর্বানন্দ, বৃদ্ধা প্রণাম করলেন।

কেউ প্রণাম করলে সর্বানন্দ সেই প্রণাম মা ভগবতীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে দেন, বলেন—মঙ্গল হোক, মা ভগবতী আপনার মঙ্গল করুন।

সেই ভোরবেলা মঙ্গলারতি থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত পূজা সমাপন করেছেন—মাতৃমন্দিরে পূজা, গুরুদেবের মন্দিরে পূজা,...সব সারা। তিনি স্বপাক ভোজন করেন, যেহেতু আজ দশহরা সুতরাং রন্ধনকার্য নেই। যাই হোক অনেকেই আজ ফলমূলাদি দিয়ে যাবে তিনি আর কতটুকু আহার করবেন! সমাগত সকলকেই ভাগ করে দেবেন।

কাজ নেই হাতে, তাই ভেবেছেন গ্রন্থ নিয়ে বসবেন—যোগিনী তন্ত্র। অনেক দিন ধরেই ইচ্ছা ছিল পড়ার, কিন্তু বইটি সংগ্রহ করতে পারেননি, সম্প্রতি এক ভক্ত একটি পাঠাগার থেকে অনেক দায়িত্ব নিয়ে বইটি সংগ্রহ করে এনেছে। বেশ জীর্ণ গ্রন্থটির অবস্থা। বইটি বইদানিতে রেখে সাবধানে পাতা ওল্টাতে হবে। ঘরের এককোণে চৌকির ওপর বইদানিতে বইটি রাখা, চৌকির সামনে আসন পাতা, তিনি আসনে বসে বই খুললেন—

যোগিনী : যোগযুক্তা নারী, তপস্বিনী। ভগবতীর অংশসম্ভূতা, সখারূপী সহচরী আবরণ দেবতা।

মৃদু উচ্চারণে তিনি পড়া শুরু করলেন :

নমোহস্তু কালৈ, কামেশ্বর্যৈ নমোহস্তু তে
নমোহস্তু দেবৈ গিরিসম্ভবায়ে, নমহস্তু গৌর্য্যে বৃজিনান্তকায়ে।
অতীর্থে তীর্থনিষ্ঠেভ্যো ব্যাসাদিভ্যো নমো নমঃ।
গণেভ্যো রক্ষকেভশ্চ্য ক্ষত্রেশেভ্যো নমো নমঃ।
পৌন্তবিঘ্ন নমস্তেহস্তু নমস্তে কালভৈরব।
নমস্তে দক্ষিণামূর্ত্ত দণ্ডপানে নমহোস্তুতে।

পাঠে বিঘ্ন ঘটল। কে যেন তাঁর পিছন দিয়ে ছুটে চলে গেল ঘরের ওপাশে। ছোটখাট কেউ। তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন—ওপাশে ওই আলনার পিছন দিকে কেউ যেন। আলনায় তাঁর দুচারটি গেরুয়া বস্ত্র, তার আড়ালে কেউ যেন, একটু ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে লাল রঙের পোষাক। তিনি উঠলেন এগিয়ে গেলেন। আলনার পিছনে দাঁড়িয়ে এক গৌরী বালিকা, পরনে লাল টুকটুকে জামা। তাঁকে দেখে বালিকা মৃদু হাসল ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে চুপ করার ভঙ্গী করল। কত বয়স হবে—বছর আট নয়—কি সরল হাসিমুখ তার।

বাইরে শিশুদের কলরব শোনা যাচ্ছে। সামনেই গঙ্গার ঘাট। আজ মন্দিরের ঘাটে অনেক স্নানার্থী। অন্যদিন এত মানুষ আসেন না। আজ দশহরা গঙ্গাপূজা—এজন্য এত মানুষের সমাগম। তাদের সঙ্গে ছোটরাও এসেছে, ছুটোছুটি করে খেলা করছে।

—কেউ আসেনি তো? —ফিস্‌ফিস্ করে বলল মেয়েটি।

—কই না তো? —দরজার দিকে দেখে তিনি বললেন।

—কেউ এলে বোলো না আমি লুকিয়েছি। কাকলির সঙ্গে বাজি ধরেছি, আমাকে খুঁজে না পেলে ও একটা ক্যাডবেরি খাওয়াবে।

—আর খুঁজে পেলে তুমি ওকে খাওয়াবে—তাই তো? —তিনি বললেন।

—তাই। —বলল বালিকা।

দেখ কাণ্ড! তিনি মনে মনে ভাবলেন—সকালবেলায় আজ গৌরী মা এসে লুকোলেন আমার ঘরে। কখন এলেন? যখন আমি যোগিনীতন্ত্র পড়তে বসেছি—মাতৃপ্রণাম, মহর্ষি প্রণাম, গণপতি প্রণাম, দণ্ডপাণি কালভৈরব প্রণাম—নমহস্তু গৌর্য্যৈ বৃজিনান্তকায়ৈ—

—এগুলো তোমার জামাকাপড়? —গেরুয়া বসনগুলি নাড়তে নাড়তে বলল বালিকা, গন্ধ নিল—কি সুন্দর গন্ধ! —বলল—চন্দনের গন্ধ, তাই না?

—হ্যাঁ। —বললেন তিনি।

—তোমার গায়েও খুব সুন্দর গন্ধ—চন্দনের—খুব কাছে এসে বলল, তাঁর গায়ে নাসিকার স্পর্শ।

অবোধ বালিকা! তিনি একটু সরে গেলেন।

—তুমি দেখতেও খুব সুন্দর—বলল বালিকা।

—তুমি আরও সুন্দর, হে গিরিসম্ভবায়ৈ পার্ব্বতি! তুমি অপরূপা! নমহস্তু, নমহস্তু, নমহস্তু তে!

—তুমি আমার সঙ্গে খেলবে?

—হ্যাঁ খেলব।

বালিকা দুহাত দিয়ে সহসা জড়িয়ে ধরল তাঁর কটিদেশ।

একি? বালিকার হাত খেলতে চাইছে একি খেলা? তাঁর শরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে—এ কি?

তাঁর সারা শরীরে সহস্র বৃশ্চিকের দংশন। দুহাতে ঝেড়ে ফেলতে চান বৃশ্চিকগুলি। সরিয়ে দেন বালিকার হাত ঠেলে দেন তফাতে।

অবাক বালিকা সন্ত্রস্ত।

কয়েক মুহূর্ত—তিনি নিজেকে সংযত করেন, বালিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন সস্নেহে, প্রশ্ন করেন—এ খেলা তোমায় কে শিখিয়েছে?

বালিকা ফিস্‌ফিসিয়ে উত্তর দেয়। শুনে তিনি হতবাক।

গতকাল থেকে তাঁর মন বড় বিষণ্ণ হয়ে আছে। সেই যে প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করলেন—নারী নির্যাতনের কথা—এ কি দিনকাল এলো?

এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বড় ঘৃণা হয়, যন্ত্রণা হয়, কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করলে তো চলবে না। চুপচাপ মাথা নীচু করে দুমিনিট বসেছিলেন, তিনি, তারপর—

এ তো শুধু একালের কথা নয় দাদাভাই—প্রৌঢ় বয়স্ক প্রশ্নকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তিনি—এ আদিকাল থেকে চলে আসছে। সেই রামায়ণের কথাই ধর, এক বীর বলশালী পুরুষ—রাবণ রাজা—ছলে বলে কৌশলে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। এক অসহায় নারী, কতটুকুই বা তাঁর শরীরে শক্তি! এখনকার ভাষায় হরণ না বলে তুলে নিয়ে গেলেন। আবার দেখ, রামায়ণের শেষ পর্বে—দীর্ঘকাল বন্দিনীর জীবনে কত দুঃখ কষ্ঠ লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়ে তিনি যখন ভাবছেন জীবনে সুখের মুখ দেখলেন—তখন প্রজারা তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে চাইছে, এবং তাঁর স্বামীও তাঁকে অগ্নিপরীক্ষার মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। কি অপমান! কি লাঞ্ছনা!

তিনি দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, বললেন—হে রাম! তুমি দয়াময়, আমি কতটুকু বুঝি তোমার লীলা! আমাকে ক্ষমা কর প্রভু!

নাটমন্দিরে সমবেত নারী পুরুষ নির্বাক।

—আবার মহাভারতে দেখ—মেনকা—স্বর্গের এক অপ্সরা—স্বর্গরাজের আদেশে তাঁকে যেতে হলো বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গ করতে। এক নারী—তাঁর নিজের সম্মান সম্মতি ইচ্ছা অনিচ্ছা—এসব কিছু নয়, দেবতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজার আদেশে তাঁকে বিশ্বামিত্রের চরিত্র হানি করতে হলো, সন্তান ধারণ করতে হলো। কিন্তু এই সন্তানকে নিয়ে তিনি কি করবেন? বিশ্বামিত্রকে কন্যাসন্তানটি সমর্পণ করে তিনি ফিরে গেলেন। আর দেখ, বিশ্বামিত্র জ্ঞানী পুরুষ পিতার কর্তব্য কণামাত্র পালন না করে সেই অসহায় শিশুকন্যাকে পথপার্শ্বে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন তপস্যায় বসতে! এ তো মৃত্যুর হাতে সঁপে দেওয়া।

সর্বানন্দ আবার দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, বললেন—হে মহাঋষি আমি আপনার পদাঙ্গুলির কণামাত্র নই, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। —এরপর দেখ আর এক দয়ালু মুনি সেই শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করলেন, তাঁকে শতকোটি প্রণাম। আশ্রমে সেই রাজকন্যা তাপসীর মতো প্রতিপালিত হলেন।

শকুন্তলা, অপরূপা শকুন্তলা যৌবনে উপনীত। সমাজ সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যৌবন কি, বিবাহ কি কিছুই জানেন না। কিন্তু এক অভিজ্ঞ পুরুষ দুষ্মন্ত—বলশালী মহান রাজা, তিনি বনদেবীর মতো শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং ভোগের তাড়নায় সকলের অগোচরে নামমাত্র বিবাহ অনুষ্ঠান করে ভোগবাসনা পূর্ণ করতে চাইলেন। শকুন্তলা বলছেন পিতা ফল আহরণে গেছেন, তিনি ফিরলে তাঁর অনুমতি নিয়ে বিবাহ করবেন, কিন্তু দুষ্মন্ত কালক্ষেপ করতে চাইছেন না। তখন শকুন্তলা রাজাকে প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন—আমার পুত্রকে কিন্তু রাজা করতে হবে। দুষ্মন্ত সবেতেই রাজি হয়ে যাচ্ছেন, যেভাবে হোক ভোগ করতে হবে! এবং মনোবাসনা পূর্ণ করে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শীঘ্রই শকুন্তলাকে

রাজধানীতে নিয়ে যাবেন বলে প্রস্থান করলেন এবং কৃতকর্ম প্রতিশ্রুতি সব ধুয়ে মুছে ফেললেন। একটু আত্মগ্লানিও অনুভব করলেন না।

প্রশ্নকর্তা এসময় কিছু বলতে চেষ্টা করলেন—কিন্তু মহারাজ—সর্বানন্দ তাঁকে হাত তুলে নিবৃত্ত করলেন, বললেন—আমি জানি আপনি কি বলবেন, আমার কথা শেষ হলে আপনিই উত্তর পেয়ে যাবেন।

একটু চুপ করে থেকে পুনরায় বক্তব্য শুরু করলেন সর্বানন্দ। নিস্তব্ধ নাটমন্দির, নিশ্চুপ সমবেত মানুষজন।

—কতদিন গেল, কত মাস, সমর্পিত প্রাণ শকুন্তলা সামান্য সেই সুখস্মৃতি সম্বল করে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। কেটে গেল ছ-বছর! অসহায় কণ্বমুনি দুই ঋষিকুমারকে সঙ্গে নিয়ে সপুত্র শকুন্তলাকে রাজধানীতে মহারাজ দুষ্মন্তর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

আবারও সর্বানন্দ চুপ করে রইলেন, তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো—বললেন—সেই করুণ দৃশ্যের কথা আমি কি করে বলব! সেই রাজসভা, মহারাজ দুষ্মন্ত আসীন সিংহাসনে, সভাগৃহে নানা গুণী মানুষ, বীর যোদ্ধা, জ্ঞানী মন্ত্রীরা উপস্থিত—সেই সভামধ্যে বালকপুত্রের হাত ধরে দাঁড়িয়ে অতি সাধারণ পোষাক পরিহিতা তাপসী শকুন্তলা। ঋষিকুমারেরা তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন—মহর্ষি কণ্ব পাঠিয়েছেন, আপনার স্ত্রী পুত্রকে গ্রহণ করুন। একথা বলে ঋষিকুমারেরা প্রস্থান করলেন।

রাজা কি করছেন? সোজাসুজি অস্বীকার করছেন। শুধু অস্বীকার করছেন না, সেই সাধ্বী নারীকে ব্যাভিচারিণী, দুশ্চরিত্রা এসবও বলছেন, রাজাকে প্রতারিত করতে চাইছেন—এইসব বলে তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চাইছেন।

—দৃশ্যটি চিন্তা করুন—বলতে বলতে সর্বানন্দ কেঁদে ফেললেন—সেই বিশাল রাজসভার মধ্যে সন্তানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে অসহায় এক নারী কাকুতি মিনতি করছেন কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁকে আরও কটুবাক্য বলছেন।

রাজসভায় সমবেত বিশিষ্ট শত পুরুষ, মধ্যে একা নারী শকুন্তলা, নির্লজ্জের মতো রাজাকে স্মরণ করাতে চাইছেন সেই ভালোবাসার কথা, বিবাহের কথা, কিন্তু দুষ্মন্ত নির্বিকার, বরং রুষ্ট।

শকুন্তলার এই অধ্যায় পড়তে বড় কষ্ট হয়। তাঁর কাকুতি মিনতি তাঁর শাস্ত্র বিশ্লেষণ—পুত্রসন্তান কি—তার বর্ণনা, স্ত্রীকে অস্বীকার করলে তার পাপ—এসব বোঝাচ্ছেন। শকুন্তলা বিদুষী, কণ্বমুনির আশ্রয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন—কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত আরও কটুবাক্য প্রয়োগ করছেন—অশালীন কথায় বিদ্ধ করছেন। তখন শকুন্তলা রুষ্ট, ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। তিনি জানেন তাঁর জন্মপরিচয়। কণ্বমুনি ধ্যানযোগে জেনেছিলেন শকুন্তলার জন্ম পরিচয় এবং একদিন কণ্বমুনি আরেক ঋষিকে যখন সেই জন্মপরিচয়ের কথা বলছিলেন শকুন্তলা আড়াল থেকে শুনেছিলেন—এখন রোষের সঙ্গে বলছেন জানো রাজা আমার পিতা কে? রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, আর মাতা স্বর্গের অপ্সরা মেনকা। শুনে দুষ্মন্ত আরও বিদ্রূপ

করছেন, বলছেন বাঃ! তোমার পিতা এক নীচাশয় অসংযমী পুরুষ যিনি এক নারীর ছলনায় তপস্যালব্ধ শক্তি বিসর্জন দিয়েছিলেন, আর তোমার মাতা স্বর্গের এক সুনিকৃষ্টা স্বৈরিণী! এই তো তোমার জন্মপরিচয়, তুমি আর কত ভালো হবে! কার না কার সন্তান নিয়ে আমাকে প্রতারিত করতে এসেছ। উঃ! ভাবতে গেলে কষ্ট হয় এক বলশালী মহারাজা সবকিছু জেনেবুঝে নিজের চরিত্রে কলঙ্ক লাগবার ভয়ে এক অসহায় নারী—যাকে তিনি গোপনে বিবাহ করেছেন তাঁর প্রতি এমন নিকৃষ্ট ব্যবহার করছেন।

আবারও প্রশ্নকর্তা কিছু বলতে চাইলেন—কিন্তু মহারাজ—তিনি হাত তুলে নিবৃত্ত করলেন, বললেন—জানি তুমি কি বলবে। মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কাব্যে আছে দুষ্মন্ত চলে যাবার পর বিরহকাতর শকুন্তলা স্বামীর চিন্তায় বিভোর হয়ে বসে আছেন। দুর্বাশা মুনি এসে অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁর হুঁশ নেই, দুর্বাশা রেগে অভিশাপ দিলেন—যার চিন্তায় তুমি বিভোর সে তোমাকে বিস্মৃত হবে। কিন্তু শকুন্তলা অভিশাপও শোনেন না। ছুটে এলেন আরেক আশ্রমবালিকা অনুসূয়া, পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করলেন, তখন দুর্বাশার রাগ প্রশমিত হলো, তিনি বললেন, রাজার দেওয়া কোনো অভিজ্ঞান দেখালে পুনরায় সবকিছু স্মরণে আসবে।

রাজা শকুন্তলাকে একটি অঙ্গুরীয় দিয়েছিলেন। তাই ঠিক হলো শকুন্তলা রাজাকে ওটা দেখাবেন তাহলে তাঁর সব মনে পড়বে। কিন্তু রাজধানীতে যাবার কালে দীর্ঘ পথিমধ্যে এক সরোবরে স্নান করার সময় অঙ্গুরীয় খুলে পড়ে যায়। রাজসভা মধ্যে শকুন্তলা যখন আঁচলে বাঁধা অঙ্গুরীয় দেখাতে যান, দেখেন অঙ্গুরীয় নেই। অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করার পর শকুন্তলা আশা করে অঙ্গুরীয় দেখাতে গেলেন কিন্তু পারলেন না, তখন রাজা তাঁকে আরও উপহাস করলেন। তখন শকুন্তলা করুণ স্বরে মাকে ডাকতে লাগলেন, মেনকা স্বর্গ থেকে এসে সপুত্র শকুন্তলাকে নিয়ে চলে গেলেন।

পরে এক মৎস্যজীবির জালে পড়া মাছের পেটে পাওয়া গেল অঙ্গুরীয়, কানাকানিতে খবর পৌঁছাল কোতোয়ালের কাছে, কোতোয়াল মৎস্যজীবিকে বন্দী করে আনলেন চোর বলে। রাজার কাছে বিচার করতে এলে অঙ্গুরীয় দেখে রাজার সবকিছু স্মরণ হলো, তখন তিনি হা শকুন্তলে বলে রোদন করতে লাগলেন। পরে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়।

কিন্তু এ কাহিনিতে কালিদাস মহাভারতের কাহিনির সঙ্গে কল্পনার রঙ চড়িয়ে কাব্য করেছেন। মহাভারতে এসব নেই। সেখানে রাজা সব জেনে বুঝে নিজের চরিত্রের কলঙ্ক ঢাকবার জন্য মিথ্যাচার করেছেন, এবং যৎপরোনাস্তি শকুন্তলাকে লাঞ্ছনা অবমাননা করেছেন।

এবার চলে যাই মহাভারতের আরেক পর্বে—দ্রৌপদী—এ কাহিনি সবার জানা। দ্রৌপদী! অযোনিসম্ভূতা নারী! যজ্ঞের অগ্নি থেকে তাঁর জন্ম, তিনি যাজ্ঞসেনী। সেই নারী—তাঁর জীবনের গ্লানির কথা—তিনি ভালবেসেছিলেন অর্জুনকে কিন্তু নিজেকে সমর্পণ করতে হয়েছিল পঞ্চপুরুষের কাছে প্রেমহীন ভালোবাসাহীন ইচ্ছাহীন শুধুমাত্র দেহ! এরপর সেই ভয়ানক দৃশ্য, সেই রাজসভা—সভামধ্যে আসীন তদানীন্তন ভারতের

সব জ্ঞানী, গুণী মহাজন, বীরপুরুষেরা তার মধ্যে লাঞ্ছিতা একাকিনী রজস্বলা সামান্য বস্ত্র পরিহিতা নারী—সব লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে স্বামীর অবিমিশ্রকারিতায়। তাঁর কেশ আকর্ষণ করে টানতে টানতে নিয়ে আসছে এক দুর্জন পুরুষ, তিনি সকলের কাছে কাকুতি মিনতি করছেন কিন্তু সকলে নির্বাক। সেই সমবেত পুরুষের দল দেখছেন সেই নির্যাতন! উঃ! —কথা থামিয়ে কাতর শব্দ করলেন সর্বানন্দ।

সমবেত মানুষজনের মধ্যে গুঞ্জন, জনৈকা বৃদ্ধা বললেন—থাক না বাবা এসব কথা, আপনার কষ্ট হচ্ছে।

—না, মা, কষ্ট হলেও অস্বীকার তো করতে পারি না এই নির্যাতন! আর এর প্রতিকার কি হয়েছে? প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে মহাকাব্য রচয়িতা কবিরা দৈবের আশ্রয় নিয়েছেন। মা সীতার করুণ কান্নায় ধরিত্রী মাতা বিদীর্ণ হয়েছে, মাতা তাঁকে গ্রহণ করেছেন। শকুন্তলার ক্ষেত্রে দৈববাণী হয়েছে—রাজা, শকুন্তলা তোমার স্ত্রী, তাঁর পুত্র তোমার ঔরসজাত, তাদের গ্রহণ করো, এবং দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে দ্রৌপদীর আকুল প্রার্থনায় এসেছেন ভগবান কৃষ্ণ, তিনি অফুরান বস্ত্র জুগিয়ে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছেন।

সমগ্র নাটমন্দির নিস্তব্ধ! একজন মহিলা মৃদুস্বরে বললেন—তাহলে এ যুগেও কি নারী নিজের সম্মান নিজের জীবন ওই দৈবের হাতে সঁপে দিয়ে অসহায় জীবন কাটাবে বাবা?

—জানি না মা, অমি জানি না—অসহায় কণ্ঠে বললেন সর্বানন্দ। আরও আছে—রাজা মহারাজা নবাব বাদশা জমিদারদের অত্যাচারের কথা! কত সহস্র অত্যাচারিত নারীর অশ্রুজলে সিক্ত এই দেশের ভূমি! এইসব দুশ্চরিত্র পশুর লালসার হাঁড়িকাঠে বলি হয়েছে কত অসহায় নারীর প্রাণ!

আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন সর্বানন্দ, মন্দিরে প্রবেশ করে সাষ্টাঙ্গ প্রণামে পড়ে ছিলেন কতক্ষণ।

সর্বানন্দ ব্রহ্মচারী। নারী স্পর্শ থেকে তাঁর জীবন দূরে। এমনকি মাকেও তিনি দেখেননি। জ্ঞান হওয়া থেকে তিনি গুরুদেবকেই বাবা বলে ডেকেছেন। সাধক তিনি, তাঁরই গড়া এই মন্দির এবং তৎসংলগ্ন যা কিছু। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বানন্দ গুরুদেবের মন্দির গড়েছেন ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কোথা থেকে তাঁকে শিশু অবস্থায় এনেছিলেন তা গুরুদেব কখনো জানাননি। উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বাল্যকালে একদিন মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে হাত ধরে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন—এই তোমার মা। এবং তখন থেকেই পূজার্চনা সেবাকার্য কিছু কিছু করে শেখাতে শুরু করেন। সংস্কৃত আলাদা করে নিজে পড়াতেন। শাস্ত্র সম্পর্কীয় পাঠ তাঁরই কাছে। এভাবে তাঁকে তৈরি করেছেন এবং বুঝিয়েছেন—সংসার তাঁর জন্য নয়। বলেছেন—তুমি মায়ের সেবক, সাথে সাথে সংসারের মানুষদেরও সেবক। তাঁদের দীক্ষা দেবে, সুখ দুঃখের কথা শুনবে, যথাসাধ্য চেষ্টা করবে মঙ্গল করার। তবে কখনও কাউকে ভুল বুঝিয়ে নিজের বা মন্দিরের জন্য

অর্থ সংগ্রহ করবে না। সাধুর জীবন গ্রহণ করেছ, সততাই তোমার মূল ধর্ম। সেভাবেই গুরুদেবের প্রদর্শিত পথে জীবনযাপন করেন সর্বানন্দ।

যে বিষণ্ণতা নিয়ে আজ দিন শুরু হয়েছিল তা এখন জ্বলন্ত অগ্নি। তাঁর শরীর জ্বলে যাচ্ছে। এই বালিকার সম্মুখে তিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেন না। তিনি যেন সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতিভূ! এই সরলমতি বালিকাকে তিনি কি বলবেন?

সর্বানন্দ নতজানু হলেন বালিকার সম্মুখে, হাত জোড় করে বললেন—মা গৌরী, এ খেলাটা ছোটদের খেলতে নেই, যে তোমাকে শিখিয়েছে সে খুব খারাপ কাজ করেছে, এতে পাপ হয়, মা কালী রাগ করেন। এসো আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করে বলি, যাতে তিনি এবারের মতো তোমাকে মাফ করে দেন।

তিনি বালিকার হাত ধরে পাঠস্থানে এলেন, যোগিনী তন্ত্র বই সরিয়ে রেখে চৌকির উপর তাকে বসতে বললেন। বালিকা কিছুটা ভীতভাবে আদেশ পালন করল। সর্বানন্দ ভক্তিমতী বৃদ্ধার রেখে যাওয়া পূজার উপাদান থেকে একটি সন্দেশ ও পদ্মফুলটি নিয়ে বালিকার বাঁ হাতে পদ্ম ও ডান হাতে সন্দেশটি দিলেন, তারপর নিজ আসনে বসলেন পদ্মাসন হয়ে, জোড় হস্তে উচ্চারণ করলেন—

নমোহস্তু কালৈ, কামেশ্বর্যৈ নমোহস্তু তে
নমোহস্তু দেবৈ গিরিসম্ভবায়ৈ, নমোহস্তু গৌয্যৈ বৃজিনান্তকায়ৈ।
ওঁ সর্বমঙ্গলং মাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্ত সাধিকে।
স্মরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।।

তিনি চোখ বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, পিছনে দরজার কাছে কাদের কলরব—নারীকণ্ঠ ও পুরুষ কণ্ঠ—ফিরে দেখলেন—মধ্যবয়স্কা নারী এক, বলছেন—ওই তো জয়ন্তী।

ওনারা কাছে এলেন, মধ্যবয়স্ক পুরুষটি বললেন—এ কি করছেন আপনি? —তাঁর কণ্ঠস্বর রুক্ষ।

সর্বানন্দ উঠে দাঁড়ালেন, এই সেই পুরুষ গতকাল যিনি প্রশ্ন করেছিলেন নারী নির্যাতন নিয়ে—

—এরা তোমার কে হয়? —বালিকাকে প্রশ্ন করলেন সর্বানন্দ।

—ঠাকুমা আর দাদু—বলল—বালিকা। —জ্বলন্ত দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ের দিকে তাকালেন সর্বানন্দ, বললেন—ওকে এক দুর্জন পাপী নষ্ট করতে চাইছে, তাই বাঁধন দিয়ে দিলাম, মা ওকে রক্ষা করবেন। আপনার মা জীবিত না গত?

—গত—ভীত প্রৌঢ় মুখ নীচু করলেন।

—এখন থেকে একে মা বলে ডাকবেন।

বালিকাকে হাত ধরে তুললেন সর্বানন্দ, বললেন—ওই সন্দেশটা ভেঙে একটু মুখে দাও মা তারপর আমাদের একটু করে ভেঙে প্রসাদ দাও।

বালিকা তাই করল। ওরা বাধ্য অনুগতভাবে প্রসাদ খেলেন।

—পদ্মফুলটা তুমি নিয়ে যাও মা, একেকটা পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোমার বইগুলির মধ্যে রেখে দেবে।

—যাও, ওকে নিয়ে যাও—হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন—জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনি...

ওরা চলে যাচ্ছে—দেখতে দেখতে অস্ফুটে বললেন—যাও মা, জীবনে দীর্ঘপথ তোমাকে চলতে হবে অসহায় হয়ে। মহাভারতের এই বিশাল সভায় অনেকে ভক্ষক আর সবাই দর্শক, কেউ রক্ষাকর্তা নেই। মা তোমাকে রক্ষা করুন আর শক্তি দিন যাতে তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারো।

বহিরাগত

প্রভাস ভদ্র

রানীগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে বাসে দেড় ঘণ্টার পথ ধবন। সেখান থেকে আধঘণ্টা মোরাম রাস্তায় হাঁটলে রামপুর গ্রাম। সাত আটশো আদিবাসীর বাসভূমি। অধিকাংশরাই কৃষিনির্ভর। গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে রামপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয় আর ধবনের হাইস্কুল। কলেজ অনেক দূরে—বাঁকুড়া আর পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে। রঘুনাথপুর অপেক্ষাকৃত কাছে। সিনেমা দেখতে হলে সেই বাঁকুড়া ছাড়া গতি নেই।

বাণ্ডু বারাং কলকাতায় হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়েছে। সেই যে পড়তে এসেছে, আর গাঁয়ে ফেরেনি। কোটায় পাওয়া চাকরি করে এখন কলকাতাতেই। বাণ্ডুবারাংয়ের কাছ থেকে রাইমণি জেনেছে, রামপুর যাওয়ার অপর একটি পথও আছে। ভায়া খড়গপুর ঝাটিপাহাড়ি রেলস্টেশন। তারপর সালতোরা হয়ে রামপুর। কলকাতা থেকে দূরত্ব এমন কিছু না। তবু, বিয়ের পর থেকে আজ অব্দি রাইমণি শুধু শুনেছে, কল্পিত গাঁয়ে যাওয়া হয়নি। স্বামীর জন্মভিটা বলে কথা। তাছাড়া, বাণ্ডুবারাংয়ের আত্মীয়স্বজন আপনজনেরা সকলেই তো সেখানে। সেইজন্য রাইমণির মনে ধরা গোপন ক্ষোভ দুঃখ প্রায়শই ঘাই মারে। বিশেষ করে আদিবাসীদের বাৎসরিক সেরা উৎসব 'সরহাই'এর সময়। ফি বছর। এবছরও ব্যতিক্রম নয়।

রাস্‌কা সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে। তখন তো আরও নানা বাধা আসবে। রাইমণি তাই নাছোড় বলল, এবার অন্তত আমি কোনও অসুবিধা—অজুহাত শুনতে চাই না। 'সরহাই' উৎসবে নিয়ে যেতেই হবে।

রাস্‌কা ওদের একমাত্র সন্তান। বাণ্ডুবারাংয়ের রাখা নাম। রাইমণির পছন্দের ছিল, আনন্দ। বাণ্ডুবারাং বুঝিয়েছে, এত বছর এখানে থেকে জাতিগত নিজস্বতা বলতে যা কিছু প্রায় সবই তো খুইয়ে বসে আছি। তাই চাইছি, ছেলের নামটা অন্তত ভবিষ্যতে ওর জাতের পরিচয়টা জানান দেবে। তাছাড়া, আমাদের ভাষায় রাস্‌কা শব্দের অর্থ তো আনন্দই। শুনতেও অনেক বেশি মিষ্টি। তাহলে তোমার আপত্তি কিসের?

মেনে মানিয়ে চলতে অভ্যস্ত রাইমণি আর নিজের পছন্দের নাম নিয়ে জোরাজুরি করেনি। বাণ্ডুবারাংও যথেষ্ট সংবেদনশীল। তাই এবার আর সরহাই উৎসবে নিজের গাঁয়ে বউ ছেলেকে নিয়ে যেতে আপত্তি করেনি।

শুধু সম্মত হলেই তো হয় না।, খরচাপাতি তো আছে। এতকাল পর গাঁয়ে যেতে

গেলে প্রিয়জনদের জন্য বেশ কিছু উপহার কেনাকাটা দরকার। তাছাড়া, সময়টা যখন পৌষমাস, হাড়কাঁপানো শীতে রাস্‌কার যাতে কষ্ট না হয় সেদিকটাও নজর রাখতে হবে। শহুরে জীবনে অভ্যস্ত মানুষকে অনেক কিছু প্রস্তুতি নিয়ে যেতে হয়।

এসব কিছু করতে গিয়ে বাণ্ডুবারাং আগাম সতর্ক করে রাইমণিকে বলল, নজরে পড়ার মতো তেমন কিছু ব্যতিক্রম আচরণ ওখানে করতে যেও না। ওদের অপছন্দের কিছু করলে কিন্তু ঘনিষ্ঠ আপনজন হয়ে উঠতে পারবে না। সব আনন্দ তখন মাঠে মারা যাবে।

বাণ্ডুবারাং সতর্ক সাবধান করলেও শহর সভ্যতায় বড় হওয়া রাইমণি পারবে কেন। পৌষের শীত যথেষ্টই। 'সরহাই' উৎসব শুরু হয় পৌষের বিশ তারিখের পরবর্তী প্রথম বুধবার থেকে। রাইমণি শুধুমাত্র রাস্‌কাকেই নয়, নিজেকেও এমন শীতের পোশাকে আবৃত করেছে যে, বাণ্ডুবারাং বিস্ময়ে হতবাক। চোখের মণি পাতা যেন আর নড়তেই চায় না। মনে হচ্ছিল, এর আগে আর কোনওদিন বোধহয় রাইমণিকে এত বেশি সুন্দরী দেখায়নি।

'সরহাই' হলো জারানদেও অর্থাৎ শিবপূজার উৎসব। গাছের তলায় যেখানে পূজা হয় সেই জায়গাটা মন্দিরের মতো। উৎসবের প্রথম দিন মাদল ধামসা বাঁশি কাঁসর র‍্যাগড়া নিয়ে নাচের আসর। রাইমণির হৃদয়মন দারুণভাবে আলোড়িত আন্দোলিত করল। কিন্তু, বিশেষ এক ধরনের যে প্রসাদটি সবাইকেই খেতে হয় সেটি যেন সহজে গলা দিয়ে নামছিল না। এছাড়াও, জ্ঞাতি নিমন্ত্রণে মুরগি (শিম) সঙ্গে হাড়িয়া পান করতেও যথেষ্ট কষ্ট হলো। নাক মুখ বিকৃত ভঙ্গি করে একান্তে বাণ্ডুবারাংকে বলেই ফেলল, এ্যা মাগো কী বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ!

চুপ, একদম চুপ। ঠোঁটে তর্জনী চেপে ধরে তালে ঠিক মাতাল বাণ্ডুবারাং সতর্ক করে বলল, কেউ শুনে ফেললে ভীষণ অনর্থ অশান্তি হবে।

ভয়ে চুপসে গিয়ে রাইমণি আর মুখে রা কাড়ল না।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনটা মেয়ে জামাই মাসি পিসি ইত্যাদি সম্পর্কের আত্মীয়জনদের আপ্যায়নের জন্য নির্ধারিত। পরিচিত অপরিচিত অনেক জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাইমণি সবিশেষ খুশি আহ্লাদিত পুলকিত হলো। চালের গুঁড়ো আর মাংস দিয়ে তৈরি পাত্‌রা পিঠা খেয়ে স্বাদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত।

রাইমণির জন্ম শহর কলকাতায়। বেড়ে ওঠা লেখাপড়া বিবাহ ইত্যাদি সবই কলকাতার বাঙালিদের সান্নিধ্যে। তাই শুধুমাত্র পাত্‌রা পিঠাই না, তৃতীয় দিনে চালের গুঁড়ো দিয়ে রান্না করা মাংস সুস্বাদু 'লেটং' আস্বাদনও জীবনে সর্বপ্রথম। আকণ্ঠ পান করে অভিভাবক গুরুজনদের চড়ামাত্রায় নাচনকোঁদন আর বেসুরো গান গাওয়া দেখাশোনাও জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বয়স্কদের পানভোজনের জন্য নির্ধারিত উৎসবের চতুর্থ দিনটিও মন্দ লাগল না।

অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটল, উৎসব অন্তের পঞ্চম দিনে।

বাণ্ডুবারাং-এর বাবা জুগু ওর বাবা বৃদ্ধ টিবলুর নির্দেশমতে রাইমণিকে সামনে হাজির করল। সঙ্গে বাণ্ডুবারাং আর রাস্‌কাও গেল। স্বাভাবিক ভাবনা আর প্রত্যাশা ছিল, সপুত্র নাতবউকে বুড়ো বোধহয় কিছু উপহার দেবে। কিন্তু, না। পরিবর্তে যা মিলল তা হলো অভাবনীয় তিরস্কার।

কিসের জন্য?

রাইমণির ভাষা পোশাক আচার আচরণে কোল ভিল সাঁওতাল ওঁরাও মুণ্ডা, কুর্মি প্রমুখ কোনো সম্প্রদায়ের কোনো মিলই নেই। বলতে গেলে আদিবাসীদের কৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত রাইমণি আর রাস্‌কা। এমন দুজন আগন্তুককে এই উৎসবে গ্রামের কেউই মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তাই সম্প্রদায়ের মাতব্বরদের সিদ্ধান্ত উৎসব অন্তে অতিরিক্ত আর একটি দিনও যেন ওরা আর এই গ্রামে না থাকে।

এই বিচার অন্যায্য, অমানবিক। বাণ্ডুবারাং প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার চিৎকার করে উঠল, জাতপাত ধর্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক একটি দেশে এমনতর বে আইনি বিচার কিছুতেই চলতে পারে না।

বাণ্ডুবারাংয়ের মা দুলালী অশুভ আশংকায় দুরু দুরু বুকে বোঝাল, মাথা ঠাণ্ডা কর বেটা। গাঁয়ের মানুষকে আমরা তো জানি। তাই তো তোদেরকে কোনওদিনও এখানে আসতে বলিনি।

—আমিও আসতে চাইনি। বাণ্ডুবারাং নিমেষে নিজেকে স্তিমিত করে নিয়ে সংযত বলল, রাইমণির ইচ্ছাতেই এই উৎসবে আসা। ও তো আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবে আপনজন আর স্বজাতি-স্বজনদের কাছে পেতে চেয়েছে। কিন্তু—

আর কুনু কিন্তু না। বাণ্ডুবারাংকে থামিয়ে দিয়ে গ্রামের বয়স্ক মাতব্বর চুনকা বলল, উত্‌সোব সক্কলের জন্য। যে কুনু জাতের মানুষের তাতে আসতে বাধা নাই। আমরাও তো তুর বহুকে বাধা দিলম না। দিলম কি?

সর্বক্ষণ নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা চুনকা যে কখন এসে হাজির হয়েছে বাণ্ডুবারাং তা খেয়াল করেনি। গ্রামের স্বঘোষিত নিয়মকানুনই আলাদা। অধিকাংশই যুক্তিনির্ভর না। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সভ্যতায় পিছিয়ে থাকা মানুষগুলিকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা অধিকাংশ সময়ই বৃথা ব্যর্থ হয়। তবু বাণ্ডুবারাং নির্ভীক বলল, রাইমণি আমার বিয়া করা বউ। আমার জন্মভিটায় আসা থাকার হক তো ওর আছে। আছে কি না?

আমিও তো জন্মসূত্রে একজন আদিবাসী। রাইমণি আবেগতাড়িত কাঁপা গলায় বিনম্র বলল, আপনাদেরই একজন। তাহলে?

তুর ভিতর আর আদিবাসীদের কুছু আদত আদরা লাই। চুনকা শান্ত মেজাজে জবাব দিল, তু এ্যাখুনম শহুরে থাকা পালটি মানুষ।

আর বাণ্ডুবারাং? রাইমণি জানতে চাইল।

মোদের বেটা হতে পারে, কিন্তু—। জুগু উসখুস মিনমিন গলায় জবাব দিল, সে বেটাও পালটিছে তো বটে।

শহুরে লিখাপড়ায় গাঁও ছেড়ে থাকা বাণ্ডু আর এই গাঁয়ের মানুষ নাই। বুড়ো টিবলু ভাঁঙা গলায় আক্ষেপ করে বলল, বাণ্ডুর মতো কতজনাই তো যায়। আর ফিরে না। ইখানকার মা মাটি মানুষ আর উদেরকে টানে না।

নির্বাক বিষণ্ণ দুলালীর দু'চোখ বেয়ে কান্নার জল ঝরছে এখন।

এই গাঁওয়ে আমার জন্ম। বাণ্ডুবারাং মেজাজ তুঙ্গে তুলে বলল, ইচ্ছা করলেই তোমরা আমাদেরকে তাড়াতে পারো না। এই অধিকার তোমাদের কারও নেই।

লিশ্চয় আছে। চুনকা ধমকে দিয়ে উচ্চস্বরে জবাব দিল, তুর মতো লিখাপড়া জানি না বটে। কিন্তু—

কিন্তু কি?

পার্টিবাবুদের থ্যেকে শিখছি তো অনেক। চুনকার চাহনিতে শয়তানি। ঠোঁটে দুর্বোধ্য দুষ্ট হাসি, তুরা এ্যাখুন এ গায়ে বহিরাগত। তুদের জন্যি গাঁয়ের মানুষগুলা বরবাদ হবেক তা মানা যাবেক না।

বাণ্ডুবারাং বিস্ময়ে হতবাক। হতোদ্যম বিষণ্ণ ভাবল, পুরুষানুক্রমে অশিক্ষিত দীনদরিদ্র সরলমনা এই মানুষগুলিকে নিয়ে অদ্ভুত এক খেলা শুরু হয়েছে এখন। এখানে সেখানে বিভেদ বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন উদ্দেশ্যে কায়েমি স্বার্থের এক শ্রেণীর মানুষ সবে হলকর্ষণ করছে। এই সময় শহরে সুখভোগে সদাব্যস্ত না থেকে ঘন ঘন গ্রামে আসা একান্ত প্রয়োজন।

জীবন স্বপ্ন

প্রবীর সাহা

আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি, সুখস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। অনেক অজানা কথা, ভুলে যাওয়া স্মৃতি, বিগত ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলো এবং আরও কত কি। কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠি আবার কখনও আতঙ্কে ঘেমে নেয়ে উঠি। সোজা কথায় আনন্দ যেমন পাই, সুখানুভূতি হয়, তেমনই দুঃখ ও কষ্ট পাই। আমি ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখি, কি দিনে কি রাত্রে। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে বা বিরাট অট্টালিকায় সুখ বিছানায়। স্বপ্নের হাত থেকে রেহাই নেই। জীবনে স্বপ্ন আসে কিন্তু সফল হয় না। সজাগ স্বপ্নের আর এক দিক আছে অবাস্তবতা। ছেলেবেলায় বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের পরিবর্তন হয়। ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম যে আমি বাস কন্ডাক্টার হব। মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদারকে হিরো ভাবতে আরম্ভ করি। কি সুন্দরভাবে রাস্তা সাফসুতরো করে তুলছে। বড় হয়ে কোনো বড় অফিসার হব এমন ইচ্ছে হলো। কেমন আঁটোসাঁটো পোষাকে টাই ঝুলিয়ে গাড়িতে চড়ে অফিস যাওয়া। কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মধ্যে মিল কোথায়। জ্ঞানের পরিধি কত প্রসারিত হবে—তা নির্ভর করে যে সমস্ত গুণাবলীর উপরে, তার অভাব বহু মানুষের মধ্যে। আমিও স্বপ্ন দেখতে দেখতে ক্লাসের পরে ক্লাসে উঠেছি এবং অবশেষে কলেজ জীবন শেষ করেছি। এখন স্বপ্ন দেখা নয়। বাস্তবের মুখোমুখি। দর্পণের সামনে পোষাকহীন আমি, আমার অক্ষমতা নগ্ন সত্য।

আমি সত্যসুন্দর। ঠাকুর্দা ভবানীশঙ্কর তার ছেলে শিবশঙ্করের দ্বিতীয় পুত্র। বড় ভাই শান্তিসুন্দর তিনি বেশ কেষ্টবিষ্টু। বেশ বুদ্ধিমান এবং সফল ব্যক্তি। আমরা এখন একসাথে থাকি না। ঠাকুরদা শিবভক্ত ছিলেন। ঠাকুরঘরে একটা প্রমাণ সাইজের শিবলিঙ্গ আছে। মা রোজ বেলপাতা দিয়ে স্নান করান। প্রতি সোমবার বিশেষ অর্চনার আয়োজন হয়। কান্নামিশ্রিত কণ্ঠস্বরে শিবস্তোত্র পাঠ করেন , আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। আরও দেবদেবী আছেন, আছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, আছেন মা সারদা। আমরা সবাই স্বপ্ন দেখি, মা, বাবা চান ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি চাই মুক্ত আকাশ—বাধাহীন জীবন।

আমি অভিনয় করতে ভালবাসি। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করার চেষ্টা করি বন্ধ দরজার আড়ালে। আমি কিছু হতে পারিনি, মানে অতি সাধারণ মানুষ হয়ে বেঁচে থাকলাম। আমি সত্যসুন্দর। নামে সত্য হলেও মাঝে মাঝে মিথ্যা বলি। অবশ্য প্রয়োজন হলে। অসত্য ভাষণে আমার অনীহা। অবশ্য চারপাশে লোকজনেদের দেখি মিথ্যা কথা বলতে তাদের আটকায় না।

আমি বিশেষ কিছু হতে পারিনি। এম. এ. পাশ করলাম, বহু চাকরির চেষ্টা করলাম। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেও ইন্টারভিউ পেলাম না বা যদিও পেলাম লিস্টে নাম উঠল না। যাক অবশেষে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, পাড়ার কমিশনার দাদার দয়ায় মিউনিসিপ্যালিটির জঞ্জাল সাফাই বিভাগে সুপারভাইজার হলাম। ছোটবেলার ঝাড়ুদার হবার স্বপ্ন এইভাবে সফল হলো। নিজেকে বেশ সমাজসেবামূলক কাজে জড়িত দেখে আত্মপ্রসাদে ভুগি। কাক যেমন ঝাড়ুদার পাখি আমিও তেমনই অফিসার। পদে গর্বিত। কিন্তু লাঞ্ছনা অন্যত্র। নাগরিকেরা বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আসেন। নিষ্পত্তি না হলে গালিগালাজ করেন, উপরি চড়চাপড় আছেই। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ছেড়ে কথা বলেন না। ট্যাক্টলেস কথা শুনে শুনে আমিও কেয়ারলেস হয়ে যাই। যাইহোক চাকুরিতে এ সমস্ত অসুবিধাগুলো থাকবেই। মাঝে মাঝে 'ওয়েলডান, গুড জব ডান' শুনতে হয়। আমি নির্বিকার, পুরস্কার বা তিরস্কার আর আমাকে স্পর্শ করে না। উপরওয়ালার মুখের উপর আমি কখনও অপ্রিয় সত্য বলি না।

আমি বিবাহের স্বপ্ন দেখি না, কোনো ঢাকাই শাড়ি বা নীলাম্বরী শাড়ির মিছিল আমার স্বপ্নে হানা দেয় না। একদম জোর করেই আমার বিবাহ হয়ে গেল। যৌবনকালে পাছে কোন ডাকিনী যোগিনীর পাল্লায় পড়ব। সত্যসুন্দরের কোনো ওজর আপত্তি শোনা হল না। ফলে সান্ধ্যকালীন তাস দাবা ক্যারাম এবং অভিনয় কিছুটা ব্যাহত হতে থাকল। বাড়ির শিবঠাকুরের মতো। তার অনুমতি ছাড়াই তাকে সারাদিন কত স্নান করতে হয়, ধূপধুনোর গন্ধ সহ্য করতে হয়। আমার অনুমতির পাত্তা না দিয়েও আমার স্ত্রী সুনন্দা রোজ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন—আমাকেও শিবজ্ঞানে আদরে যত্নে ভরিয়ে দিতে চায়। থিয়েটারের ঝোঁক থাকায় সেটার জন্য সপ্তাহের তিনদিন ছাড় পেতাম রাত করে বাড়ি ফেরার। স্ত্রীর গোমড়া মুখ, বকাঝকা বেশিদিন সহ্য করতে হলো না—দুটি ছেলে একটি মেয়ে হওয়ার পর আমার উপর থেকে চাপ কমে এল। কারণ ওদের নিয়ে ব্যস্ততা। দশভূজা হয়ে তিনি সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব পালন করেন। আমি মাঝে মাঝে স্নেহময় বাবার দায়িত্ব পালন করতাম।

ছেলেরা মানুষ হয়েছে। দু'জনেই ইঞ্জিনিয়ার, মেয়েও ডাক্তার এবং বিয়ে হয়ে গেছে। আমার জন্য ওদের ভালবাসা একটুও কম নয়। আমিও আবদার মিটিয়ে ওদের সাথী হয়েছি কখনও কখনও। আমি সারদিন প্রোভাইডার।

আমার স্বপ্ন নাটক। মঞ্চের চড়া আলোয় নিজেকে মেলে ধরতে আমার প্রাণ আকুল হয়ে থাকে। চাকুরিতে ঢোকার আগে অনিয়মিত নাট্যগোষ্ঠীতে যোগদান করেছিলাম। সেটাই পুষ্ট হয়েছে এতদিনে, অভিনয়ের শিক্ষা সেই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে। এতটা বয়স পর্যন্ত সেই অপেশাদার গোষ্ঠীতেই থেকে গিয়েছি। লোকেও আমাদের বেশ আদরের সঙ্গে স্মরণ করেন। চরিত্রকার হিসাবে আমার পরিচিতি হয়েছে। আমাদের নাট্যগোষ্ঠীর নিজেদের জেলা তো বটেই পাশের জেলাগুলোতেও নাম ছড়িয়ে গেছে নাট্যমোদী মহলে। এর জন্য দৈনন্দিন সংসার জীবনে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। ফলে প্রতি মুহূর্তে

নিজেকে মেলে ধরার স্বপ্ন আরও জাগ্রত হয়ে থাকে। মঞ্চে প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমি ফোকাস্‌ড হতে পারি বা আমার আগমন ও নিষ্ক্রমণ যেন রাজোচিত হয়। যেন লোকে বলে যে নট সত্যসুন্দর যথার্থ শিল্পী। শিল্পীর কুশলতা জীবনকে ভেদ করে যাবে।

হঠাৎ একদিন একটা নাটকের শেষ দৃশ্যে আমার শেষ ডায়লগ্‌ 'বেশ আমি চললাম' বলার পরে হার্ট অ্যাটাকের অভিনয় করতে হবে, হঠাৎ এ কি? বাস্তবে বুক চেপে বসে পড়লাম, দর্শকদের করতালি শুনতে শুনতে আমি জ্ঞান হারালাম।

আমি সত্যসুন্দর। আমার জীবনে নাটকীয়তা নেই। তরঙ্গহীন সাধারণ জীবন। অভিনয় আমার নেশা। আজ আমি কোমায় আচ্ছন্ন। চারিদিকে বিভিন্ন নল, যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা চালু আছে। আমি শায়িত। কিন্তু মাথার ভিতর এক বোধ কাজ করছে। শেষ সংলাপ 'বেশ আমি চললাম' কেটে কেটে বলছি, স্পটলাইট আমাকে কভার করেছে। আমার হাহাকারের দৃশ্যে আমাকে আলোকিত করছে। প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি দর্শকবৃন্দ। তাদের অভিনন্দন আমি দুহাত দিয়ে গ্রহণ করছি। আমার পরিতৃপ্ত, উজ্জ্বল উদ্ভাসিত মুখ প্রচণ্ড গরিমায় উঁচু হয়ে আছে। গভীর সুখ ও শান্তিতে আমি তলিয়ে যাচ্ছি...

ভাসান

সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল

বসন্ত বিদায় নিয়েছে। গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রাণীকুল অতিষ্ঠ। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কালনাগিনী নিস্তেজ। সন্ধ্যা সমাগমে গোধূলি বেলায় তটে ওরা কতিপয় খেলার শেষে গোল হয়ে বসে। জ্যোৎস্নাভরা—চতুর্দশীর চাঁদ উজ্জ্বল তামাটে আলোর উচ্ছ্বাসে মন মাতোয়ারা। ঘর্মাক্ত গেঞ্জি জামায় ওরা আরাম বোধ করছে। মাঠ বলতে তো ঐ নদীতটটুকু। গ্রামের ছেলেরা খেলে সময় কাটায়। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা বারোমাস। বয়ে যায় স্রোত—ভেসে যায় পালতোলা নৌকা—, বায়ু কম হলে দাঁড়ের শব্দ ছন্দের তালে তালে হারিয়ে যায় আঁকা বাঁকা জলপথে কোন্ গ্রাম কোন্ ঘাটে কে জানে।

জিরিয়ে নেওয়ার ফাঁকে শীতল কথাটা উত্থাপন করল। ডিম্‌ফা, ক্যাকটাস, সন্তু, চিত্ত, ভগী, মনা, বিট্‌কে, নেত্যরা শুনে কথাটা লুফে নিল। নদীবাঁধে তখনও যারা বসে আরাম ভোগ করছে অথবা ঝাউ ইউক্যালিপটাসের সারিতে বসে থাকা কাক শালিকের দলও আনমনা হলো। ওদের সমবেত গলার আওয়াজ বড্ড উচ্চ মাত্রার। ওরা উদ্দাম, দুর্নিবার।

—শোন্ আঁরা একই সংগে পয়লা বৈশাখ গণেশ পূজা কইরজুম। শীতল বলেছে। ধনীর ছেলে। বাপের খায় আর পোদ্দারি করে। এবছর ইলিশের টাকা পরিমাণে বেশি পেয়ে আরও বেশি স্বেচ্ছাচারী এবং বিলাসিতা বেড়েছে।

ওরা স্কুলছুট প্রায় সকলেই। দেশ বিদেশ মিলিয়ে হতচ্ছাড়াগুলো। বাংলাদেশ থেকে আগত, কেউ কেউ এদেশীয়। বাঙাল ঘটির মিলিত ডেঁপো ছোঁড়ার দল।

পূজা হবে। আনন্দ সকলের। আর পূজা মানে তো কয়েকটা দিন হৈ-হুল্লোড় খাওয়াদাওয়া মজা ফূর্তি আমোদে সময় গড়ানো।

—এবারে পূজায় আমি মাইক দুবো। প্যান্‌প্যানানি ভট্‌কের মাইক চলবেনি। আমার বিশেষ পরিচিত, কাকার জ্যেঠ্‌শ্বশুরের ছেলের সমন্ধির মাইক, 'রাজা সাউণ্ড' দশটা জেবিএল বক্স আনবা—হর্ন লুবা চল্লিশটা—পাশের 'নিউ জেনারেশন'-এর ফালু খেলো মালগুলাকে দেখি দুবো পূজা কাকে কয়। মনা বলল।

মনা এই দেশীয়। বাপে ভ্যান টানে। মা করে ঝিগিরি—মাঠে শাক তোলে, ধান, গোবর কুড়ায়। প্রত্যহ বাপ রাত্তিরে বাংলা ঢক্‌ঢক্ গিলে গলা ভিজিয়ে বাড়ি ফেরে পা

টলতে টলতে। শুরু হয় দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা মহম্মদ বিন্ তুঘলকের টাটকা খিস্তি খেউড় অথবা বীরবিক্রমশালী শেরশাহের মতো বীরত্ব। যা ঝুল কালিবর্ণ বউকে মনে করে বাঘ বা সিংহ। বউটা কুঁকিয়ে কাঁদে। ওদেরই ছেলে মনা দেবে মাইকের খরচ চাঁদা।

—আমি ভাই ভুঁরিওলা গণেশরে দিমু। আমার মনের বাসনা পূরণ করসে—আরো যদি পূরণ করে তার লাইগ্যা। কুমারটুলি, না নিমাই চিত্রকরেরে কমু বানাই দিব। ক্যাকটাস বলল।

—তইলে বাদ থাইক্‌ল কি? সন্তু চেঁচিয়ে বলল।

—শোন পূজার পরে একদিন তোর শিকারে যা হবে এই চরে হবে খানাপিনা। রাজী কিনা বল? ভগী বলল।

—কোনও ঝামেলা নাই। হক্কলে কইলে চলব।

—শিকারে যাইবি কোন্‌হানে?

—সে আমি কমু ক্যান্। খাওনের কথা খাইবি। ব্যস্।

হঠাৎ নেত্য বলল, তোর বন্দুকটা আমাকে দুবু?

—কেনরে চদনা বন্দুক নিয়া কি করবি? নিলে পাখিমারা বন্দুক ক্যান্? মেসিনগান নে—রিভলবার নে। মাইরবার লাইগ্যা কইতাস?

—হুম্। লুবো, প্রয়োজনে—লুবো।

—বুঝসি। হালার পুত্ হালা বিরঙ্গার মাইয়াডারে মারবি।

—কি করবো ভাই। রাজী করাইতে পারিঠিনি।

—তইলে গণেশ পূজায় মাইয়া পুয়ারে লই বেগ্গিনে খামু। শীতল বলল। বলে হেসে উঠল সবাই।

—কেমনে? সন্তু বলল।

—নাসইন্যার পুয়া বুঝ্যি নো পার। পরে কইয়ুম। পূজার কথা ফাইনাল কর। রথ দেখা কলা বেচা সবই এত্তে হইব। শীতল ঝাঁঝিয়ে বলল। একটা সিগ্রেট ধরাল।

ওরা পূজার দিনক্ষণ ঠিক করল।

ক্যাকটাসের পাখিমারা বন্দুক আছে। পূজার পরে পাশাপাশি নদীর চরে বেড়ে ওঠা গাছগুলোতে কত নাম না জানা পাখি ছাড়াও শামখোল, ঘুঘু, পায়রা, বক, পানকৌটি ইত্যাদি বসে ওগুলা শিকার করে খাবে বনভোজনে। সঙ্গে মদ বা আরও কিছু। সেই কথা ভেবে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছে।

সকলের চাঁদা একত্রিত করে অবশিষ্ট খরচ লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন শীতল দাস আছে।

বিরঙ্গের মেয়ের কথা সবশেষে বলে চুপিচুপি। তারপর তিনবাঁশ উপরে অসম্পূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ, এক এক করে চলে গেল। স্নান সেরে বাড়িতে ঢুকতে হবে। আগামী কাল থেকে চাঁদা তুলতে হবে এই স্বীকারোক্তি করে বাড়ি ফিরে এল সবাই।

পরদিন সমবয়সী ছাড়াও ছোট বড় সকলের কাছে সারা গ্রাম ঘুরল। আদায়ও কম

হয়নি। পরস্পরের আলোচনায় কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নিল। প্রতিমা, প্যান্ডেল, আলো, মাইক, ব্রাহ্মণ যাবতীয় যথাসময় মতো পৌঁছে যাবে।

পূজার প্যান্ডেল হবে মিশ্র বাড়ির পাশে মাঠটায়। চারিপাশে দু'তলা তিনতলা ঘর গাছগাছালিতে বেশ বেষ্টন হয়ে আছে। সবকিছু হচ্ছে—কিন্তু থানা পারমিশান দিচ্ছে না—বলে প্রয়োজন মনে করেনি পারমিট নিতে হবে। বড় কথা পরীক্ষা চলছে। ওসব নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই। চন্দননগরের আলো আসবে। মাইক তো বাজবেই—আলোর বাজি না রেখে শব্দবাজির দায়ভার বিট্‌কের। যা খরচ হবে—সবই ওর।

কয়েকদিন প্রতীক্ষার পর আজ সেই দিন। পয়লা বৈশাখ। বাঙালির ঘরে মাছ, মাংস। পোলাও, দই, মিষ্টি ইত্যাদি ভালো খাবারে পরিপূর্ণতা পাবে। তা না—গ্রামের পূজায় চাঁদা দিয়েছে তাই সব ঘরে মনমরা হতাশার ছায়া—নিরামিষ খেতে হবে। সংস্কারের বশে গ্রামসুদ্ধ লোক।

পূজা প্যান্ডেলের চারপাশে যতগুলো ঘর আছে একমাত্র রাণাদের ছাড়া সকলের ঘরে পরীক্ষার্থী। আগামীকাল পরীক্ষা দিতে যাবে—আজ নববর্ষ বলে ছুটি। কিন্তু মনার ইচ্ছামতো সেই সাউণ্ড বক্সগুলি সামনে পিছনে করে বসানো হয়েছে—মাইকহর্ন চারিদিকে গাছে গাছে বাঁধা হয়েছে। সকাল না হতেই প্রবল বেগে চড়া সুরে বেজে উঠল। পূজা বলে কথা। বিরঙ্গের মেয়ে রুক্মিণী মুখে ব্রাশ দিতে দিতে বলে গেল, সাউণ্ড আস্তে কর, ভাই পরীক্ষা দেবো। দাদুর প্রেসার। গান বাজাও আস্তে—নইলে বাবাকে চেনো তো?

যেই না বলা—আরও শব্দের মাত্রা চড়িয়ে দিল।

কথাটা শীতলের কানে গেল। শীতল এসে বিট্‌কেকে বলল, —ইবার কথা কইল নে?

—দুশ্‌ শালা—এই তো সেই স্বপ্নের দুয়ার।

—মালটা তো বেশ। শালা পুষ্টু মাল। বেশ ডব্‌কা ডাগর। উম্‌-আঃ-দুধু খাবো রে—? শীতল বলল।

রুক্মিণী শুনতে পায়নি মাইকের জন্য। সে চলে যাচ্ছে, পিছনের দিকে তাকিয়ে শীতল আফশোষ করছে।

আধুনিক চটুল গান চলছে। মাটি কাঁপছে এত জোরে শব্দ। বিকট আওয়াজে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অতিষ্ঠ আর শঙ্কিত। মেয়েটির মৃদু প্রতিবাদে আরো বেশি গম্ভীর এবং শব্দদস্যুর তাণ্ডবে পূজা প্রাঙ্গণ পর্যুদস্ত। শীতলের 'ডুকাটি' দুই চাকার যানটিও পাশে দাঁড় করানো। সেটাও কাঁপছে। সঙ্গে শুরুতে দু'একজন নাচতে শুরু করেছে। মনা বলল, চালাও মস্তি। 'দিল্‌বর দিল্‌বর হা দিল্‌বর দিল্‌বর', 'হে হে চাঁদনে কুছ কহা', 'আই অ্যাম এ ডিসকো ড্যান্সার', 'অ্যায়সি দিবান্‌গি দেখি নাহি কাহি', 'স্যাটরডে স্যাটরডে', 'তু আসিক হ্যায় ম্যায় তেরি আসিকি', 'ও তসুবর কা আলম' ইত্যাদি গানের ভাষা সুর রোমান্টিকতা গ্রহণযোগ্যতা তুলনাহীন। কিন্তু ডিজে সংযোগ করে আকাশ বাতাস তোলপাড়

করে কথার চেয়ে শব্দ তাণ্ডবে ওরা মাতোয়ারা। কোনও ভক্তিগীতি নেই, পূজার গান নেই। আকাশ ভাঙা শব্দ।

তখন সকাল ন'টা। নিমগাছের মাথায় সূর্য উঠেছে। রুক্মিণীর বাবা পঞ্চায়েতে কাজ করে। অফিস যাবার পথে পূজা কমিটির সাউণ্ড রুমে উঁকি মেরে বলল, এই যে বাবুরা আগামীকাল পরীক্ষা, আমার বাবা বয়স্ক মানুষ অসুস্থ—সাউণ্ডটা কন্ট্রোলে রেখে বাজাও। তবে বাংলা গান—। অনেক ভালো গান আছে। বিট্‌কে বলল, ঠিক আছে কাকু, বিষয়টা ভেবে দেখছি আপনি আসতে পারেন। তখনও ডিজে চলছে। ঘন বসতি এলাকা। বিট্‌কে এসে মাইকম্যানকে বলল, বাংলা গান চালাও। একটু সময় চালাও তারপর দেখা যাবে। ও তাই করল। কিন্তু ডিজে সংযোগ রেখেই। 'আমি স্বপ্নে তোমায় দেখেছি', 'এ শুধু গানের দিন এ লগন গান শোনাবার', 'কাগজে লেখো নাম কাগজ ছিঁড়ে যাবে', 'পথ হারাবো বলে এবার পথে নেমেছি', 'তার আর পর নেই নেই কোনো ঠিকানা' ইত্যাদি গানেও গুব্‌গুব্ ডিজের সম্মিলিত সাউণ্ড বক্সের আওয়াজ। সুন্দর মধুর চিরন্তনী গানেও ডিজের তাণ্ডবে অস্বস্তিকর মনে হয়। যত বেলা বাড়তে থাকে রোদও বাড়ে—গরমও বাড়ে, শব্দের তাণ্ডবও বাড়ে। রুক্মিণীর দাদু আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে দক্ষযজ্ঞ বেঁধে যায়। জ্ঞাতিরা কোলপাঁজা করে ভ্যানে তুলে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘটোত্তলন হবে। ব্রাহ্মণ এসে গেছে। শুরু ঢাকের আওয়াজ। তাও ডিজে সংযোগে।

পরমব্রত রুক্মিণীর ভাই। পড়তে পারছে না। দাদু অসুস্থ। বিকট শব্দে ইংরাজির পড়া কিছুই মনে রাখতে পারছে না। পরীক্ষায় কি হবে ভেবে কিনারা করতে পারছে না। বিরামহীন তাণ্ডবের সঙ্গে দোদমা, চক্‌লেট, গাছবোম্, জলবোমের শব্দে মুখরিত আশ পাশের গ্রামগুলিও। এই আয়োজনের সাথে আবার বাজনা—তামসিক পূজা বলে কথা। বাজনার তালে তালে নাভির তলায় চলে যাওয়া প্যান্ট পরে, জীর্ণ পাঁজর দেখিয়ে, বগলের চুল দেখিয়ে—ঘট আনতে যাচ্ছে ঠাকুরের প্রাণ। সেই নদী সেই তটি—সেই বাণি, হেঁতাল, বকুল, তেরা, কেওড়া গাছের জঙ্গল ভেদ করে রাস্তায় চলেছে ঘটোত্তলনে। ভয়ে পাখিরা দিশেহারা, যে যার মতো উড়ে পালাচ্ছে—, পোষ্য ছাগল গরুগুলা লাফিয়ে লাফিয়ে কাছাকাছি থেকে আরো গভীর জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। এমনিভাবে সারাদিন রাত আনন্দে নিমগ্ন। পরদিন সকালে বিসর্জনের ঘট ভাসান হয়েছে প্রতিমা বিসর্জন হয়নি। ওদের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো আজও প্রতিমা থাকবে। কালকে নদীচরে বনভোজন, প্রতিমা বিসর্জন এবং মস্তি।

পরমব্রত কি লিখবে পরীক্ষায় তাও জানে না। ভয়ে তটস্থ। কিছুই মনে নেই। বেরিয়ে যাবার সময় মা ওকে দিদির সাথে যেতে বলল, আসার সময় দুজনে হাসপাতাল থেকে দাদুকে দেখে আসবি।

দু'দিন মণ্ডপ নিকটস্থ কারও ঘুম হয়নি কানের পর্দা ফেটে যাওয়া আওয়াজে। ঘুম নেই সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করা দিনমজুরের। ঘুম নেই পশুপাখি সমস্ত পল্লীবাসীর।

সকাল থেকে ঘট ভাসানোর পর পাশের জঙ্গলে বেরিয়ে গেল বন্দুক নিয়ে। সারাদিন ঘুরেও ওরা পেল না কোনও শিকার পাখি কিংবা পশু।

পরমব্রত যেমন হতাশ হয়েছে পরীক্ষা দিয়ে এসে এরাও শিকারে বেরিয়ে হয়েছে। শীতলই আগ বাড়িয়ে বলল, গোধূলি বেলায় মাইক বাজানো বন্ধ করবি। পাখিরা নিজেরা বাসার টানে ফিরবে। আর বিয়ানে ঘরতুন্ তিন্যা বন্দুক আনবি আঁইও যায়ুম—সামনে যা পাম্ মারিয়ারে লয়ুম। ওরা তাই করল।

আজ বিসর্জনের দিন। নদীচর ছেড়ে ওরা জঙ্গলে বনভোজনের ব্যবস্থা করেছে। রং আবির বস্তা বস্তা সঙ্গে মদের পেটির সারি। বারে বারে মাইকে ঘোষিত হচ্ছে কতিপয় সদস্যের নাম। যারা রাতে বনভোজনের শরিক হবে।

পরমব্রত আর পড়তে বসে না। মনে মনে এত হতাশা গ্রাস করেছে যে কোনও উপায়ন্তর নেই। শুধু ও নয় যেখানে যারা ছিল সকলেই হতাশাগ্রস্ত। সারাদিন দিদির সঙ্গে আমের আচার তৈরি করে খেয়েছে। দু'চারটে পাকা আম নিয়ে ভাইবোনে খুনসুটিও করেছে। তখনও ডিজে লাগিয়ে উচ্চমাত্রায় বাজনা চলছে।

চটের ব্যাগে ওরা বনের পাখি মেরে এনেছে। সারা রাস্তা রক্ত পড়েছে। শীতলরা মণ্ডপে যারা ছিল রেগে এক দু'কথায় টাটকা খিস্তি দিতেই যেখানে রান্না হবে সেখানে রেখে আসল। মিঠু আর মনা ওখানে বসে। ভগীরা দেখে অবাক। —কি করেছিস্, এত বড়? —হ্যাঁ, হরিণ। মেরেছি বন্দুক দিয়ে।

—কিভাবে ছাড়িয়ে মাংস নিবি?

—সে ঠিক হয়ে যাবে। কাউকে বলিসনি যেন।

আকার ইঙ্গিতে সবাই জেনেছে। বনের হরিণের মাংস রাত্রে চাটে চলবে—পাখির মাংসও। ঐ ডেঁপো ভবঘুরে ছেলেগুলো যেন কতদিন খায়নি। নতুন আনন্দের ধারা বইছে মনের ঘরে। সকলে নির্বাক। সময়মতো রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম সহ প্রয়োজনীয় তেলমশলা পাচক সেই মোটা হেঁতাল ঝোপের আড়ে যে প্রশস্ত রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে— ওখানেই হাজির। সাদা ভাত আর মাংস সঙ্গে বোতল।

প্রকৃতির কোলে প্রকৃতিজাত মানুষ পাখি পশু সবুজ বন, নদী। মা কি দুষ্টু সন্তানকে মেরেই ফেলে? তা তো নয়—। কেউ যদি মরে বা মারে তাও প্রকৃতি নিরুপায়।

প্রতিমা বিসর্জনে শব্দ আর চটুল গানের মাত্রা ছাড়িয়ে বিষময় লাগছে। প্রতিবেশীরা একে একে এগিয়ে এসে সতর্ক করছে—কে কার কথা শোনে। এদিকে পরমের বাবাও বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে হাসপাতালে। প্রশাসনিক কোনও পদক্ষেপ নেবার কারোরই সাহস নেই।

শিকার থেকে ফিরে এসেছে জেনে পেটি খুলে রাম, রয়্যাল স্ট্যাগের বোতল কয়েকটা শীতলের নির্দেশে মাইক রুমে আনিয়ে পান করল। তারপর উদ্দাম নৃত্য। সন্ধ্যা হয় হয়। পাখিরা বাসায় ফিরছে। গ্রাম্যবধুরা কাঁখে কলসি নিয়ে জল আনতে চলেছে। মাঠ থেকে দুষ্টু গরুগুলিকে প্রৌঢ়া ও যুবকরা গলার দড়ি ধরে গোয়ালস্থ করছে। গ্রামের মাঝে সরু

রাস্তায় ছোট ছোট শিশুরা বউ বাসন্তী খেলে মায়েদের আনন্দ দিচ্ছে। ওদের পূজার পাশে ওরা ছাড়া কেউ নেই।

খবর আসলো পরমব্রতর দাদুর অবস্থা ভালো নয়। শ্বশুরের ক্ষীণ দুঃসংবাদ শুনে বউমা হাসপাতালে গেছে। বাড়িতে সে আর রুক্মিণী।

পাশের মসজিদ থেকে আজান শোনা যাচ্ছে। তুলসিতলায় পতিব্রতা কুলবধুরা একে একে উঠানে প্রদীপ ধরিয়ে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে। কাঁসর ঘণ্টার বাদ্যি বাজলেও দানব শব্দ ছাপিয়ে গৃহকর্তার কানে আসে না।

জ্যোস্নারাত্রি হলেও দু'একটা জোনাকি ঝোপ, বেড়ায়, কেয়াগুচ্ছের পাতায় নয়তো শেয়ালকাঁটা ও ফণিমনসার ডগায়। রুক্মিণী রান্নাঘরে। ও জানত ভাই পরমব্রত পরের দিনের পরীক্ষার পড়া পড়ছে। একটু আগে দিদিকে কথায় কথায় বলেছিল, গলায় দড়ি দিলে মানুষ মরে?

—ধুৎ ওসব কথা মুখে আনতে নেই। যা পড়তে বস্।

রাত দশটা—ভ্যানগুলি সারি দিয়ে দড়ি বাঁধা। জেনারেটর, লাইট, প্রতিমা সারির ক্রমান্বয়ে। মণ্ডপের সামনে আবিরের বস্তা। পলিথিনে এক এক করে পূরণ করছে। জিন্সের পকেটে কোমরে ব্লেন্ডার স্পাইট্, ভদকা, ইমপেরিয়াল ব্লুর বোতল বাঁধা। জেবিএল বক্সগুলি চারটে ভ্যানে বাঁধা, হর্নগুলিও প্রতিটা ভ্যানে। গণেশ ভাসান যাত্রা। সারা গ্রাম ঘুরিয়ে কালনাগিনীর জলে ভাসবে প্রতিমা।

রুক্মিণী রান্নার পর ঘরে পরমব্রতকে খুঁজতে এলো। পড়ছে কিনা, না ঘুমিয়ে গেল, মনে করে ভাই ভাই করে এগিয়ে দেখল—ভাই আর ভাইয়ের ঘরে নেই। আলো জ্বলছে সে নেই। পাশে বাবা-মার শোবার ঘর—অন্ধকার। বাইরে বেরিয়ে দেখল তাও নেই। গ্রাম পরিভ্রমণের প্রয়োজন না মনে করে নদীবাঁধে গেল—যে পথে ওরা আসবে চরে। হয়তো ভাই পরমব্রত ভাসানে সঙ্গী হয়েছে ওদের, সেই ভেবে। ওরা আসছে সেই পথে—দাঁড়িয়ে দেখে নিতে পারবে।

শীতল মদ্যপ অবস্থায় আবির নিয়ে মাথায় ঢেলে সর্বশরীরে মাখিয়ে দিল—এক এক করে ওরা মাখাতে মাখাতে বাঁধের নীচে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁধের আড়ালে আর কিছু দেখা যায় না। যদিও জ্যোৎস্না, গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। চরে প্রতিমা রেখে উদ্দাম নাচ নাচতে লাগল। সমানে চলছে বক্সের বাদ্যি। শব্দের মধ্যে হারিয়ে গেল আর একটা যন্ত্রণার শব্দ, নির্যাতনের ছবি মিলিয়ে গেল জ্যোৎস্না পুলকিত গাছের পাতায়। অবর্ণনীয় অত্যাচারের চিহ্ন লোপ করতে শীতল ও তার বন্ধুরা যৌনাঙ্গ ধুয়ে দিল ভদ্কার রঙিন জলে আর রক্তাক্ত, বেদনার্ত, নিথর রুক্মিণীকে ওরা কালনাগিনীর স্রোতে হাত পা ধরে ছুঁড়ে দিল। পরিশেষে গণেশের শুঁড়ে ইম্প্যারিয়াল ব্লুর ভর্তি বোতল ধরে পান করতে বলছ্যেরা।

—খা শালা খা—, মদ খাবি না পূজা খাবি।

সে রাতে ওরা প্রতিমা এভাবে ভাসিয়ে নিশীথের বনভোজনে গেছে। মদ মাংস

খেয়ে ওরা ভাত খেতে পারল না। অবশিষ্ট তেল মশলা তরকারি প্লাস্টিক পাতা, আবর্জনা ফেলে দিল নদীতে। নীরব নদী ওদের অত্যাচার এখনও সহ্য করে চলেছে। নেত্য শেষে জ্বলন্ত কাঠের আগুন হেঁতালের শুকনো পাতায় ধরিয়ে রাতারাতি খাক্ করে দিল কালনাগিনীর চরে বনজ সম্পদ।

অনেক রাত্তির, সারা গ্রাম ঘুমিয়ে গেছে। কয়েক রাত ওরা ঘুমাতে পারেনি। দাউ দাউ করে জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। স্ত্রীকে হাসপাতালে রেখে পরমের বাবা গ্রামের পথে বাড়ি আসছে। পোষ্য কুকুরেরা দূরের আলোর শিখা দেখে ঘেউ ঘেউ করছে। মনে খুব ভয়। দুটো বাচ্চা বাড়িতে, ফিরতেই হবে। দেখল এসে দরজা খোলা।

—'খুকী খুকী—বলে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে টর্চ মারল এদিক ওদিক। জানালা দিয়ে আলোয় দেখল পরম শুয়ে বিছানায়—কোথা থেকে যেন কীটনাশকের গন্ধ ভেসে আসছে। মাথাটা ঝাঁক করে উঠল। ভয়ে কাঁপতে লাগল সে। চোখে তার অন্ধকার।

নিরুদ্দেশ

মৌতৃষা চৌধুরী

শ্রেয়া আর নিলয়ের সম্বন্ধ করে বিয়ে ঠিক হয়েছে। শ্রেয়া তার হবু শ্বশুরবাড়িতে জানিয়েছে যে, শিক্ষকতাটা শুধুই তার পেশা নয়, নেশাও। নিলয় ও তার পরিবারের শ্রেয়ার চাকরি করা নিয়ে কোনো আপত্তিও নেই। আর বেশিদিন বাকিও নেই তাদের বিয়ের। জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হতে আর মাত্র একুশ দিন বাকি।

এ সময় বড্ড মনে পড়ে শ্রেয়ার নীলাঞ্জনার কথা। নীলাঞ্জনা হল তাদের পাড়ার-ই একটি মেয়ে। শ্রেয়া ভালোবেসে তাকে নীলাদি বলতো, শ্রেয়ার শুধুই সে দিদির মতোনই ছিল না ... ক্লাস ফাইভ থেকে টেন অবধি নীলাদির কাছেই শ্রেয়া পড়াশোনা করত, সকল বিষয় ... নীলা হল পাড়ার খুব মেধাবী ছাত্রী। পাড়ায় প্রথম এমন কোনো মেয়ে যে কিনা খুব স্বল্প পয়সায় শ্রেয়ার মতন এমন আরও ছেলে-মেয়েকে পড়াতো। শুধু পড়ানোর পুথিগত শিক্ষাই নয় জীবনে বাঁচার এগিয়ে চলার জীবনীশক্তিও দিত। নীলার বাবা রিটারমেন্টের পর নীলা টিউশনি করে শুধু নিজের পড়ার খরচই চালাতো না, সিংহভাগ খরচই চলতো নীলার টাকায়। কিন্তু এত চাপের মাঝেও নীলার মুখের হাসি ফ্যাকাসে হয়নি। বরং কোনোদিন ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড হয়নি নীলা। ছাত্র-ছাত্রীদেরও সবসময় নীলা এই শিক্ষাই দিত জীবনে নম্বরটা সব নয় ... নিজের পরিচিতি তৈরি করা খুব জরুরি। এইসব কথাগুলো শ্রেয়ার মনকে বেশ নাড়া দিত।

শ্রেয়ার বিয়ের চাপ, স্কুলের চাপ সবকিছু মিলিয়ে নিজেকে বেশ ক্লান্ত লাগে। মাঝে মাঝে মনের পটে নাড়া দেয় নীলাদির স্মৃতি। এসব ভাবতে ভাবতে শ্রেয়া ফেরীঘাটের কাছে এসে পড়ল। নিলয়ের এখানেই আসার কথা। নিলয়ও অফিস সেরে শ্রেয়াকে নিয়ে কিছু কেনাকাটা করবে। কিন্তু নিলয়ের আসতে এখন পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট বাকি। শ্রেয়ার স্কুল ছুটি হয়ে গেছে ঠিক বিকেল চারটেয়। দুজনের দেখা করার ব্যবধান প্রায় এক ঘন্টা। তাই সময় কাটানোর জন্য শ্রেয়া বাগবাজারে মায়ের ঘাটে এসে পড়ল। পড়ন্ত বিকেলে গঙ্গার এক অপরূপ শোভা। এখানে শ্রেয়া আগে আসতো। যখন সে কলেজে পড়তো বাগবাজারেই কলেজ ছিল, জীবনের অনেক স্মৃতি কেটেছে এই মধ্যকলকাতাকে ঘিরে। আজ সে বউ হতে চলেছে সাউথের কোনো এক বনেদী পরিবারের ... কিন্তু সুখী হবে তো সে? ... যতক্ষণ না বিয়েটা হচ্ছে জীবনের কথা কে বলতে পারে?

ফেরীঘাটের দিকে আরেকটু এগিয়ে শ্রেয়া হঠাৎ দেখল নীলাদিকে। কি আশ্চর্য্য!

যার কথা ভাবছিল তিনিই তার সামনে। কিন্তু এ কি অবস্থা.... পরনে সাদা-হলুদ প্রিন্টের একটি ছাপা শাড়ি। গায়ের রং আগের মতন উজ্জ্বল আর নেই। চেহারা দেখে চিনতে পারার কথা নয়। তবু চিনল। চেহারা শীর্ণকায় হয়ে গেছে। এই সেই নীলাঞ্জনা। শ্রেয়ার পরম আত্মার আত্মীয় নীলাদি! হাতে একটা বড় ব্যাগ। সেই শেষ দেখেছিল তাকে এগারোটা বছর আগে...কনের সাজে....।

ফিরে গেল শ্রেয়া কয়েকটি বছর আগে। নীলাদির কোচিং ক্লাস একদিনও কামাই করতো না কেউ। পাড়ার মধ্যে বিশেষ সুন্দরী এক মেয়ে। সরল, মিষ্টভাষী। যখন ক্লাস টেনে তখন শুনত নীলাদির বিয়ের কথাবার্তা চলছে। কিন্তু এত যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন নীলাদির বিয়ে হচ্ছে না এ নিয়ে তাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। নীলাদির বাবা একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর হাতে যেটুকু টাকা পেয়েছিলেন তা দুই মেয়ের বিয়ের জন্য ডিপোজিট করেছিলেন, যাতে নমোঃ নমোঃ করে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার মুক্তি হয়। আর যেটুকু টাকা ছিল তা দিয়ে কোনোমতে সংসারের অন্ন সংস্থান হলেও বাকি চাহিদাগুলো পূরণ হত নীলাদির টিউশনির টাকায়। যখন নীলাদির বাবা রিটায়ার করলেন নীলাদি তখন সবেমাত্র কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছেন। অনেক কষ্টে এম এস সি-তে ভর্তির টাকাও জোগাড় করেছিলেন কিন্তু সেই বছরই বোন নিলীমা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে তাই নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়ে ঐ টাকা দিয়ে বোনকে শুধু কলেজেই ভর্তি করে দেননি, নতুন পোশাকও কিনে দিয়েছিলেন। বাড়ির বড় মেয়ে সে ... তাই হাসি মুখে সংসারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডীতে যেতে গিয়েও তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে। মেধা হার মেনেছে দারিদ্রের কাছে।

শ্রেয়াদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। প্রশ্নপত্র দেখাতে গিয়ে তখন শুনলো নীলাদির বিয়ে ঠিক হয়েছে। মনে মনে খুশি হলেও কোথাও যেন বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল শ্রেয়ার মতন অনেকেরই। তাদের এত ভালোবাসার নীলাদি দূরে চলে যাবে এটা ভেবে অনেকের চোখেই জল এসে গেল। নীলাদি বলল—আরে! তোদের পরীক্ষার জন্যই তো বিয়ের রেলগাড়িটাকে সিগন্যাল দিইনি। খুব ভালো রেজাল্ট করবি সকলে। যখন পড়তে মন চাইবে না, বই খুলে বসে থাকবি না। এইরকম আরও অনেক কিছু ... দু ঘন্টা মতন সময় কাটল সেদিন নীলাদির সাথে কিন্তু কে জানতো এই তাদের শেষ আড্ডা।

বিয়ের দিন এসে উপস্থিত। সকাল থেকে সানাই-এর বিষাদময় সুর। পাশের পাড়ার দিব্যেন্দু ঘোষের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র ব্যাঙ্কে কর্মরত পাত্র দীপ্ত ঘোষ, বরবেশে এসে গেছে। বিয়ে বাড়িতে হই-চই, হুল্লোড়, বিকেল থেকে কফি-ফিসফ্রাই-এর গন্ধে চারিদিক মো মো করছে ... আজ সব চাইতে সুন্দর দেখতে লাগছে নীলাঞ্জনাদিকে। পুরো মা দুর্গার মতোন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় নীলাদি আর তার ছোট বোন নীলিমা দুজনে আজ একই রকম বেনারসী পরেছে, একই ভাবে সেজেছে। বিপত্তি ঘটল বিয়ের মন্ডপে শুভদৃষ্টির

সময়। ছাদনাতলায় উপচে পড়া ভীড়ের মাঝে যখন পানপাতাটা সরল.... হৈ হৈ রব। এমা.... নীলাঞ্জনা কই; নীলিমা যে। কিছু মুহূর্তের জন্য সব থেমে গেলেও ঐ একই লগ্নে নীলিমা আর দীপ্তর বিয়ে হয়ে গেল। সবাই যখন বিয়েবাড়ি তোলপাড় করে নীলাঞ্জনাকে খুঁজছে, পাওয়া গেল নীলাঞ্জনার পরনের লাল বেনারসী, গয়না, শুধু নেই নীলাঞ্জনা.... নীলাদি কেন এমনটা করল তা সকলের কাছেই প্রশ্নের। রেখে গেছিল একটা মাত্র চিঠি, তাতে লেখা ছিল—গুছিয়ে ঘরকন্না করিস বোন। বাবা-মা-র দায়িত্ব আজ থেকে তোর।

পাড়া-প্রতিবেশী কারুর কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্যই ছিল না যে, এমন কাজ নীলাঞ্জনার মতো মেয়ে করতে পারে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছিল—"তলায় তলায় কারুর সাথে মেলামেশা ছিল হয়তো।" এইসব মন্তব্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন নীলাঞ্জনার বাবা বলেছিলেন—বেঁচে থাকতে কোনোদিনও মুখ দেখতে চাই না ঐ মেয়ের। সবার মাঝ থেকে এভাবেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলেন সবার প্রিয় নীলাদি। মা খুব কান্নাকাটি করতো, থানায় ডায়েরী করেও কোনো লাভ হয়নি। সবাই আশা ছেড়ে দেয় আস্তে আস্তে।

সেই নীলাদিকে আজ হঠাৎ ফেরিঘাটে দেখছে শ্রেয়া! খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে নীলাদিকে, দরদর করে ঘামছে। শ্রেয়া কাছে গিয়ে হাতটা ধরে বলল—"নীলাদি চিনতে পারছো।" চমকে উঠল নীলাদি, মুখে ক্লান্তির রেশ কাটিয়ে বলল—"তোদের কি ভুলে যাওয়া যায়।"

এতগুলো বছর পর মনে কত প্রশ্ন ভীড় করে আসছে শ্রেয়ার মনে, সে কোনটা ছেড়ে কোনটা জিজ্ঞেস করবে বুঝে উঠতে পারছে না। বিয়ের কোনো মাঙ্গলিক চিহ্ন নেই নীলাঞ্জনার মধ্যে। বলল দিদি—সেদিন সন্ধ্যার পর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে? জানো, তোমার বাড়ির সবাই কতটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিল, সেই লগ্নে নীলিমাদির সাথে দীপ্তদার বিয়ে হয়ে যায়।

স্মিত হেসে নীলাদি বলল—'সেটাই তো হওয়ার ছিল।'

কৌতূহল না চাপতে পেরে শ্রেয়া বলল—তবে তুমি বিয়েতে মত দিলে কেন দিদি?

নীলা বলল—আমি জানতাম না নীলিমা আর দীপ্ত পরস্পরকে ভালোবাসে.... জানলাম, ঠিক গায়ে হলুদের পর... নীলিমা তখন বাথরুমে গেছিল। খাটের উপর মোবাইলটা অনেকক্ষণ বাজছে দেখে ফোনটা ধরে জানতে পারি... দীপ্ত আর নীলিমা ঐদিনই পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে অকথ্য ভাষায় অনেক কথা শুনিয়েছিল নীলিমা। বলেছিল সে সবসময় মহৎ সাজতে চায়, তাই নাম কুড়োবার জন্য সংসারে এত করে। মানের থেকেও বেশি মনে লেগেছিল নীলার ছোটবোনের এহেন আচরণ। কষ্টটাকে হাসি মুখে মেনে নিজের হাতেই কনের সাজে সাজিয়ে দিয়েছিল নীলিমাকে। অনুরোধ করেছিল, পালিয়ে না যেতে। কিন্তু সে নিজেই হারিয়ে যাবে, লগ্নভ্রষ্টা হয়ে বাঁচতে চায়নি।

শুনে শ্রেয়া অবাক। এত বড় ঝড় বয়ে গেছে কেউ হয়তো আন্দাজই করতে পারবে

না। শ্রেয়া জানাল—তাদের বসতবাড়িটা প্রোমোটিং হচ্ছে... বাবা মারা গেছে নীলাদির। মা থাকে নীলিমাদিদের সাথে....

বাড়ির খবর পেয়ে চোখটা জলে ভরে গেল... নীলাদির। শ্রেয়া নাছোড়বান্দা। দুজনে মিলে একটা চায়ের দোকানে বসল। শ্রেয়া দু কাপ চা আর গরম সিঙাড়া অর্ডার দিল। জানতে চাইল—এখন কোথায় থাকে?

গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় একটি অনাথ শিশুদের হোম রয়েছে। সেখানেই অবৈতনিক শিক্ষিকা হিসেবে পড়াই। একা মানুষ ওখানেই থাকি। আর হাত খরচের জন্য ঐ আশ্রমের তৈরি সস, পাঁপড়, ধূপকাঠি, আচার বিক্রি করি। এই ব্যাগ দেখছিস এতে ভর্তি এইসব রয়েছে।

কিছুতেই নীলাদি চা-সিঙাড়ার টাকা শ্রেয়াকে দিতে দিল না। শ্রেয়া বলল—দিদি তোমার মোবাইল নাম্বারটা দেবে?

"আমি এত ব্যস্ত নই রে, কে আমায় ফোন করবে বল? ওসব আমার লাগে না।"

বুকটা কষ্টে ফেটে যাচ্ছে শ্রেয়ার, এইভাবে যে কখনও নীলাদির সাথে দেখা হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। একটু সহযোগিতা করবে বলে, বলল—"দিদি আমি তো আচার খেতে খুব ভালোবাসি। তোমার তৈরি আচার আর ধূপকাঠি দাও। ব্যাগটা খুলে শ্রেয়া টাকা বের করেছে।

নীলা বলল—"আমার ঋণ শোধ করতে পারবি?"

একগাল হেসে বলল—ধূপটার খুব সুন্দর গন্ধ। আর আচার খেতে খেতে আমায় মনে করিস।

তাড়াহুড়ো করে ব্যাগটা নিয়ে লঞ্চঘাটে এগোতে এগোতে ভীড়ে আবারও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল নীলাঞ্জনা—শ্রেয়ার একান্ত ভালোবাসার মানুষ—নীলাদি।

কন্যাশ্রীর বাবা

অনুপকুমার আচার্য

নার্সিংহোম থেকে ফিরছিল ছন্দোময়। সঙ্গে নীলাশা।

ডাঃ ঘোষের সঙ্গে কিছু দরকারী কথা ছিল। কিছু খুঁটিনাটি। ছন্দোময়ের বাড়িয়ে দেওয়া চেকটিতে একপলক নজর বুলিয়ে হেলায় ভরে দিলেন দেরাজে।

—আশা করছি, খুব শিগগিরই আপনাদের সুখবরটা দিতে পারব। হাসলেন ডাঃ ঘোষ। আত্মবিশ্বাসের হাসি। ঝকঝকে। ছন্দোময় উঠে দাঁড়াল।

ততক্ষণে মেয়েটির কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে নীলাশা।

বাইকের স্পিড বাড়ছিল। এতক্ষণে মক্ষীর টিউশন নেওয়া শেষ হয়ে গেছে। মেয়েকে পিকআপ করতে হবে। প্রায় রোজকার কাজ। তবু ক্লান্তি নেই। একঘেয়েমিও না। মেয়েদের প্রাণান্তে ভালবাসে ছন্দোময়। দুটো মেয়ে নয়, দু'চোখের মণি।

মেয়েরাও বাপির নামে অজ্ঞান।

মক্ষী ক্লাস সেভেন। ফুলের মতো। প্রায় ফোটার মুখে। পড়াশুনো কথাবার্তা হাসিতে খরশান।

লোয়ার কিণ্ডারগার্টেনে সবে যাওয়া-আসা শুরু করেছে পুণ্যা। জাপানি পুতুল বলে ভুল হবার সম্ভাবনা যে কারও। পুতুল বটে। তবে নট্ নড়নচড়ন গোছের নয়। বরং এককথায় টরটরে। প্রায় সব ব্যাপারেই দিদিকে পেছনে ফেলে দেবার দৌড়ে ছুটছে।

দুই মেয়েকে নিয়ে অফুরান স্বপ্ন ছন্দোময়ের। নীলাশারও।

নীলাশা গৃহবধূ। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও। নীলাশা আকাশ চেনে। ছোঁবার সাধ অসীম। পথঘাটও অচেনা নয়। 'নো হাউ' প্রখর।

ছন্দোময় তল্লাটের সম্ভাবনাময় প্রমোটার। বছর দশেক আগেকার টিমটিমে দশা এখন স্মৃতিবিলাস।

তিনজন বাড়ি ফিরল। নীলাশা—মক্ষী সোজা ভেতরে। গ্যারেজে বাইক ঢুকিয়ে ছন্দোময় সামান্য পেছনে।

মা-বাবা নিজেদের ঘরে। ছন্দোময় টের পেল পুণ্যার সাড়াশব্দ নেই। গেল কোথায়! এতক্ষণে বাপির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। দিদিকে নিয়ে পড়েছে হয়তো। নাকি নীলাশার কাছে। ছন্দোময় ভাবল।

ঘরে ঢুকেও দেখল না মেয়েকে। নীলাশা ডাকাডাকি করছে।

—মা-র ঘরে নেই তো! ছন্দোময় জিজ্ঞেস করল।

—আমি তো ও-ঘর থেকেই এলাম! নীলাশার গলায় বিস্ময়।

মক্ষী বাথরুম বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে এসেও হতাশ। নাম ধরে ডাকাডাকি। সাড়া নেই কোনও। পুণ্যা কোথায় গেল? ওর ক্যাডবেরিস ছন্দোময়ের পকেটে।

হাঁকডাক শুনে বাবা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। —একটু আগেও তো ছিল তোর মা-র কাছে। ছেলেকে বললেন অপরেশ।

ছন্দোময় ছিটকে গেল হঠাৎ। পুরনো দিন ভেসে উঠল চোখের সামনে।

পুণ্যা সবে জন্মেছে। দু'দিন পরে নার্সিং হোমের বেডে নীলাশার পাশে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। স্বর্গের মতো দৃশ্য। পরিপূর্ণ ছন্দোময় নরম হেসে নীলাশার কপাল ছুঁয়েছিল। —কেমন লাগছে?

নীলাশা চোখ বুজে ছিল। চোখ মেলে দেখল ছন্দোময়কে। কথা বলল না। চুপচাপ। কিছুক্ষণ।

ছন্দোময় দেখছিল নীলাশাকে। ব্যগ্র কৌতূহলে। নীলাশার মুখে আঁকিবুকি। নানা রঙের কোলাজ। —আমি এবার অন্যরকম ভেবেছিলাম। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল নীলাশা।

চমকে উঠেছিল ছন্দোময়। ছন্দপতনের শব্দে।

দেবোপম পুণ্যা কি সেদিন কিছু টের পেয়েছিল?

বাড়িসুদ্ধ বিভ্রমের রঙ বদলে যাবার আগেই সজোরে সুখের শব্দ করে পুণ্যা হাজির! আচমকা সবাইকে বোকা বানিয়ে দেবার মজায় হেসে লুটোপুটি।

পুণ্যাকে দেখে সবাই অবাক। হাঁ একেবারে। এ কোন্ পুণ্যা! থ্রি প্লাস পুণ্যার নাকের নীচে কালো রঙে আঁকা গোঁফ। ছেলেদের মতো। ভ্রূযুগল স্পষ্ট করে তোলা—নিখুঁত কালির আঁচড়ে। কব্জিতে মানানসই ডায়ালের জেন্টস মডেলের ঘড়ি!

ছন্দোময় হাসবে না কাঁদবে—হদিশ পেল না। নীলাশা মক্ষী পুণ্যার মতোই হেসে গড়াগড়ি । দাদু-ঠাম্মির দশাও প্রায় তাই।

সপ্তা দুয়েক পর, বিকেলের দিকে সাইটের অফিসে বসেছিল ছন্দোময়। ডাঃ ঘোষের ফোন এল। ছেলে হয়েছে। খবরের সঙ্গে অভিনন্দন।

কিছুই অজানা নয়। তবু চোখ বুজল ছন্দোময়। এবার ডাক্তারের সঙ্গে মেয়েটির বকেয়াও মিটিয়ে দিতে হবে। তার ছেলের জন্মদাত্রীকে।

আকৃতি

সুকান্ত পাল

—দ্যাখ মা এই পৃথিবীতে সবাই কিন্তু একইরকম হয় না। আর হতেও পারে না। বিশ্বাস কর, সবাই যদি একই মনোভাব নিয়ে জন্মাতো, তাহলে কি শুভ-অশুভ বলে সত্যিই কিছু থাকতো? নাকি কোনোকিছু স্থায়ী হতে পারতো? আচ্ছা বেশ, ওসব নাহয় ছেড়েই দিলাম, তুই-ই বলতো মা, তোর হাতের পাঁচটা আঙুল কি এক?

—ও মা প্লিজ..., অন্তত তুমি এসব বোলো না। কি লাভ বলো আমাকে ওসব মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে? আর যাই হোক এত কিছু ঘটার পর আমি যে আর নতুন করে কিছু ভাবার অবস্থায় নেই, সেটা তো তোমার থেকে ভালো কেউ জানে না মা, তাহলে কেন বারবার এক কঁথা বলে যাচ্ছ? আর যা হবার নয়, আমি তো বলে দিয়েছি, তারপরেও তুমি...

এমন সময় হাসির ফোনটা আবারও বেজে উঠলো, সেই একই নাম্বার থেকে কল, সকাল থেকে নাহলেও অন্তত একশোবার কল কেটে দেওয়া হয়েছে, তারপরেও কল আসা থামেনি, বেশ কয়েকবার অফও করে দিয়েছে, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তাই এবার একটু বিরক্তির সঙ্গেই ফোনটা রিসিভ করলো হাসি। —কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি কি বাংলা বোঝেন না নাকি? আমি আসতে পারবো না বললাম তো, আর আমি কেনই বা যাবো? কি চান আপনি?

—আপনার সাথে দেখা করতে।

—ভারী অদ্ভুত লোক তো মশাই।

—ভূত কি অদ্ভুত সে নাহয় এসে দেখেই বিচার করবেন।

—উফ! আপনি যেই হরিদাস পালই হোন না কেন, আমি যেতে পারবো না ব্যাস।

—আরে এত তাড়াতাড়ি নামটা ভুলে গেলেন, আমি তো হরিহর পাল।

—সে আপনি যেই হোন, আর ফোন করবেন না প্লিজ, নাহলে আমি কিন্তু এবার পুলিশে যাব। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে বাধ্য হবো।

—অভিযোগ করবেন, তা বেশ তো করুন না। কে মানা করেছে। কিন্তু প্লিজ অভিযোগ করার পরে অন্তত একবার দেখা করে যান।

হাসি এবার আর কিছু না বলে ফোনটা কেটে দিল। তারপর ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বাচ্ছাদের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে বলে উঠলো—কি নিয়ে যাব বলো

তো মা? আমার যে কিছুই নেই, আর যা আছে তা দিয়ে তো ওর মন ভরাতে পারবো না। তাহলে এক ঘটনা বারবার ঘটিয়ে কি লাভ বলো? সেই তো আমাকে বিয়ের পর ঠক, প্রতারক নানা কথা শুনতে হবে, আমি পারবো না মা, বিশ্বাস করো আমি পারবো না। সেই রাতটার কথা যখন আজও আমি মনে করি তখন নিজেকে খুব ঘেন্না হয় মা, খুব ঘেন্না হয়। কি করবো বলো মা? যদি আমার আকৃতি বড় না হয় তবে আমি কি করবো? একি আমার হাতের তৈরি বলো?

—চুপ কর মা চুপ কর, কাঁদিস না। অন্তত একবার গিয়ে সামনে দাঁড়া। তারপর সবটা খুলে বল মা, দ্যাখ রাজি হয় কিনা!

—কিন্তু।

—আর কোনো কিন্তু নয় মা, যা একবার দেখা করে আয়। কেন জানি আমার মনটা আজ বড় সায় দিচ্ছে। যা, ঘুরে আয়।

—এই হাসি, কি হল, কি এত ভাবছো?

—না, কিছু না।

—কিছু না বললেই হবে, বলো কি ভাবছো?

—তেমন কিছু না রে বাবা, আসলে আজ আমার পুরানো কথাগুলো খুব মনে পড়ছে।

—উফ্‌ফ! আবার...

—জানো হরি সেদিন কেন তোমার সামনে আসতে চাইনি?

—কেন?

—ভেবেছিলাম তুমিও যদি আমার আকৃতির কথা শুনে আমাকে হিজরা বলো, যদি বিয়ের পর আবার ফুলশয্যার রাতে আমাকে অপমানিত হতে হয়, যদি তাড়িয়ে দাও, তাই আমি আর নতুন করে কিছু শুরু করতে চাইনি। তবে মায়ের কথা শুনে একরকম বাধ্য হয়ে যখন সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন কোনোকিছুই লুকাইন, এমন কি ভেতরে ব্রা পর্যন্ত পরে যাইনি। তারপর তুমি যখন সবকিছু জানার পরও আমাকে গ্রহণ করলে বিশ্বাস করো, আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

—তাই বুঝি? তা এখন কি মনে হয়?

—এখন মনে হয় সব পুরুষের আকৃতি সমান নয়।

—মানে?

—মানসিকতা।

হা হা হা...

(অ) শুভ বিজয়া দশমী

প্রদীপ সেনগুপ্ত

আজ দশমীর সকাল। প্রতিবারের মতো বিপিনবাবুর মনটা এবারেও বিষণ্ণ। সেই সকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে আলোকসজ্জা খোলা। কিছু জায়গায় তো মণ্ডপও খুলতে শুরু করে দিয়েছে। এ যেন বিসর্জনের আগেই ঠাকুরকে নির্বাসন।

যে প্রতিমার অঙ্গসজ্জা, আলোকসজ্জা দেখতে কাতারে কাতারে দর্শনার্থী আসতো, মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকতো, তিথি পেরোনোর সঙ্গেসঙ্গেই সেই মৃণ্ময়ী প্রতিমা ব্রাত্য হয়ে গেল। সকাল থেকেই বলাবলি শুরু হয়ে গেছে, 'আজ শুভ বিজয়া।'

বিপিনবাবুর এখানেই আপত্তি। যে দশমী পুজোর সমস্ত আনন্দ উৎসবকে স্তব্ধ করে দিয়ে শোকের আবহ এনে দেয়, সে কি করে শুভ হয়? আর যাই হোক দশমী কখনও শুভ হতে পারে না।

প্রতি বছর নবমীর রাত থেকেই মেজাজটা তাই নিরানন্দ হতে থাকে। কিছুতেই বিজয়া দশমীর আগে শুভ কথাটা বিপিনবাবু মেনে নিতে পারেন না। কেউ যদি ঠাকুর বিসর্জনের পরে এসে বলে, শুভ বিজয়া, নমস্কার নিন বিপিনবাবু—

বিপিনবাবু বেশ বিরক্ত হয়েই প্রতি নমস্কার করেন। কি এমন খুশির দিন রে বাবা, যে আনন্দে ডগমগ হয়ে নমস্কার, কোলাকুলি করতে হবে? মনে মনে বলেন, অশুভ বিজয়া দশমী।

এরপর থেকেই বিপিনবাবুকে হিসাব করে চলতে হবে। কারণ, আনাজ কিনতে যাবেন? হাতে গ্লাভস পরে আনাজের গুণমান পরখ করতে হবে, না হলেই হাতে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা।

লক্ষ্মীপুজোটা সাধারণত দুর্গাপুজোর বাজেট থেকে ম্যানেজ হয়ে যায়। কিন্তু যাদের বাড়িতে 'এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে' থাকে তাদের হাবুডুবু অবস্থা।

এরপরেই কালীপূজা—শক্তিরূপিণী কালীভক্তদের মনের মতো চাঁদা দিতে না পারলেই কার কার নাম ওদের বলির লিস্টে উঠে যাবে বলা মুশকিল। এরপরেও বিপিনবাবু বিজয়া দশমীকে কি করে শুভ বলেন?

এবারের ব্যাপারটা আরো মর্মান্তিক, আরো অশুভ।

নবমীর রাতেই ছোট বউমা নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছে। ডেলিভারী কেস। ডাক্তার বলেছে, অবস্থা ভালো নয়—হয় মা বাঁচবে, না হয় বেবী। দুজনকে একসঙ্গে বাঁচানো মুশকিল।

কাল রাত্রে অতিথিদের মিষ্টিমুখ করানোর মিষ্টি আনতে যাবার আগে, মানিব্যাগটা টেবিল থেকে আনতে গিয়ে দেখে, ব্যাগটা নেই। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, পাওয়া গেল না, কোথায় গেল? এই কোথায় গেল কোথায় গেল চিন্তায় বোধহয় ব্লাড-প্রেসারটাই বেড়ে গেল।

তবে বিপিনবাবু মনে মনে দৃঢ় ধারণা লালন করেন এই অশুভ বিজয়া দশমী কিছু না কিছু অঘটন ঘটাবেই। কিছু না ঘটলেই শঙ্কিত হতেন। কি জানি আরো কত বড় বিপদ অপেক্ষা করছে?

রাত নটায় খবর এল বিপিনবাবুর নাতনি হয়েছে। বাচ্চা ও মা দুজনেই ভালো আছে। বিপিনবাবুর বুক থেকে উৎকণ্ঠার বড় পাথরটা নেমে গেল। তাহলে কি বিজয়া দশমী সত্যি শুভ?

এই নাও তোমার মানিব্যাগ, খাটের তলায় লক্ষ্মীপুজোর পেতলের হাঁড়ি বার করতে গিয়ে পেলাম।

নাঃ, আর কোনো সন্দেহ নেই, বিজয়া দশমী শুভই। অন্তত এ বারের জন্য।

প্রতিবছর নিখিলবাবুই প্রথম বিপিনবাবুর কাছে আসেন। এবারেও এসেছেন। নিখিলবাবু জানেন, বিজয়া দশমীকে শুভ বলা পছন্দ করেন না বিপিনবাবু। তাই শুধুমাত্র কোলাকুলি আর কুশল শুভেচ্ছা জানিয়ে বিজয়ার সৌজন্যপর্ব সমাধা করেন। এবারে নিখিলবাবু ঘরে ঢোকামাত্র উৎফুল্ল কণ্ঠে বিপিনবাবু বলে ওঠেন, শুভ বিজয়া দশমী হে নিখিল। এসো কোলাকুলি করি।

নিখিলবাবু অবাক! তোমার কাছে আবার দশমীটা শুভ হল কবে?

এই আজই, কিছুক্ষণ আগে। আমার নাতনি হওয়ার খবর পেলাম। তখন থেকেই এক মায়ের বিষাদের বিদায় বিসর্জন, আর আরেক মায়ের খুশির শুভ আগমন। আরে বসো বসো। আমার ছোট মেয়ে কৃষ্ণনগর থেকে সরভাজা এনেছে, একটু টেস্ট করে দেখ!

না হে, আমার আবার সুগারটা মনে হয় বেড়েছে।

আরে কি দারুণ জিনিস, কি ভালো টেস্ট, আর ভালো মানেই শুভ। দু-একটা শুভ সরভাজা খেলে, তোমার অশুভ ব্লাডসুগার কিছুই করতে পারবে না। বুঝলে হে।

দুজনে হাহা করে হেসে উঠলো। সমস্ত পরিবেশটা খুশি খুশি হয়ে বিসর্জনের বিষাদকে ভুলিয়ে দিল।

মুখোশ

সর্বাণী দাস

দেবেশের সাথে আমার ভালোমন্দে দিন কাটছিল। ঝগড়াঝাটি যে হত না তা নয়। ঝগড়া হলেই দু-চারজন স্বামী-স্ত্রীর উদাহরণ দিতাম আমি। 'দেখো তো আমাদের অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে কি সুন্দর সম্পর্ক। কখনোই ওরা একে অপরের নামে কোনো অভিযোগ করে না।' বন্ধুদের সামনে আমাকে অনেক সময়ই অপমান করতো দেবেশ। যদিও আমি তখন হেসে ঢাকবার চেষ্টা করতাম।

একদিন আমাদের এক বন্ধু অমিতদের বাড়ি গেছি আমরা ওদের বিয়ের তারিখে না জানিয়েই, ওদের বিস্মিত করব ভেবে। অমিত দরজা খুলে দিয়ে আমাদের ভেতরে আসতে বললো। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'অলকা কোথায়? আজ তো তোমাদের বিশেষ দিন।'

ও একটু ইতস্তত করে বলল, 'না-মা-নে ও একটু ওর বাবার বাড়িতে গেছে। কাল হঠাৎ খবর এল ওর বাবা অসুস্থ।'

অমিতকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা বেরিয়ে আসবার জন্য পা বাড়ালাম। ও বললো,'একটু বস আমি এক্ষুণি আসছি।' বসবার ঘরে টেবিলের ওপর রাখা একটা পত্রিকার ওপর আমার নজর গেল। পত্রিকাটা নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি সাদা কাগজে লেখা রয়েছে একটি চিঠি। কৌতুহল বশতঃ পড়তে লাগলাম, যা লেখা তাতে বুঝলাম অমিত ও অলোকার সম্পর্কের মধ্যে বহুদিন থেকেই টানাপোড়েন চলছে। তাই অলোকা স্থায়ীভাবেই ওর বাবার কাছে চলে গেছে।

মনটা ভার হয়ে এল, ভাবলাম আমাদের জীবনও এরকম মুখোশের আড়ালে ভাঁজ করা চিঠি।

হঠকারিতায় নেওয়া একটা সিদ্ধান্ত

দীপ্তনীল ব্যানার্জি

মা সেই যে বিরক্ত হয়ে রান্নাঘরে ঢুকল এখনো বেরনোর নাম নেই। বাবা চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে রেখে আর একবার তিথিকে দেখে বললেন, 'দেখ মা, তুই তো জানিস আজ অবধি কোনোদিন তোর কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিনি। যখন তুই খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলি এবং যেটা সম্পূর্ণ তোর নিজের হঠকারিতার জন্য, তখনও যতটা পেরেছি তোর সাথে থেকেছি। তুই কি অস্বীকার করতে পারিস?'

তিথি মাথাটা নীচু করে আঁচলের ডগাটা নিজের আঙুলে গোটাতে গোটাতে বলল, 'কখনো অস্বীকার করেছি বাবা?'

'তাহলে এটা বোঝ যে আজ যখন আমার মনেও সন্দেহ আসছে তখন কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। আমায় বিশ্বাস কর। এরকম করিস না। মাথায় রাখিস অরিন্দম তোর জীবনে র‍্যাদার আমাদের সবার জীবনে ভগবানের মতো।'

তিথি একইভাবে মাথা নিচু করে বসে।

'মন খারাপ করিস না মা। যা মিটিয়ে নে। এরকম একটু আধটু হয়। তোর যদি অসুবিধে থাকে তাহলে বল আমি ফোন করে ডেকে নিচ্ছি।'

তিথি একইভাবে মাথা নিচু করে বসে।

ফোনটা হাতে নিলেন অমরেশবাবু। 'বল মা কখন আসতে বলব? না কি তুই নিজেই কথা বলবি?'

এবার মুখ খুলল তিথি। 'দরকার নেই বাবা। আমি ডিসিশন নিয়ে নিয়েছি এটার আর পরিবর্তন হবে না।'

অমরেশবাবুর মতো শান্ত লোকও নিজের ধৈর্য হারালেন এবার। 'হ্যাঁরে, আমার মেয়ে হয়ে তুই এতটা অকৃতজ্ঞ কি করে হলি? তুই কি ভুলে গেছিস ও তোর জন্য কি না করেছে এক সময়?'

না, তিথি একটা কথাও ভোলেনি, অরিন্দম কি করেছে তিথির জন্য। তিথিকে বিয়ে করেছে অরিন্দম। দুজনের দ্বারা ধর্ষিত একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। ছোটবেলার বন্ধু। স্কুল আলাদা হলেও কলেজ এক। ডিপার্টমেন্টও। অন্তত বারো বার প্রপোজ করে বারো বার প্রত্যাখ্যাত হয়েও অরিন্দম সাথে ছিল তিথির। অরিন্দমকে বাড়িতে ম্যানেজ দিতে বলে যখন রাহুলের সাথে চুটিয়ে প্রেম করছে তখনও হাজার কষ্ট পেলেও সাথে ছিল অরিন্দম।

যখন নিজের জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে এনে মদ খাইয়ে নিজের এক বন্ধুর সাথে মিলে সারারাত ধরে বারবার ধর্ষণ করেছিল রাহুল, তখন মা বাবার সাথে পাগলের মতো তাকে খুঁজে বেরিয়েছিল অরিন্দম। যখন তাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তখনও দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অরিন্দম তাকে বলেছিল, 'আরে চাপ নিস না, কিচ্ছু হয়নি। ওইসব বাজে বয়ফ্রেন্ডরা একটু আধটু জোর করে চুমুটুমু খায়। এখন তো আমি আছি।' ওই অবস্থাতেও হেসে ফেলেছিল তিথি। তখন ওর কতই বা বয়স, বাইশ হবে। প্রায় দু বছর লেগেছিল সেই ভয়ঙ্কর রাত কাটিয়ে তিথির জীবনে আবার সূর্য উঠতে। এরপর অরিন্দম ছাড়া আর কাউকে নিজের জীবনে ভাবতে পারেনি তিথি। আর তিথির মা বাবা? তারা তখন ভাবছিলেন আত্মীয়-স্বজনের থেকে ঠিক কতদূরে গিয়ে বাসা বাঁধলে মেয়ের বিয়েটা ঠিক করে দেওয়া যায়। এই অবস্থায় অরিন্দমের প্রস্তাব সত্যিই তাদের কাছে ভগবানের আশীর্বাদ হয়েই এসেছিল।

ভালো ছিল ওদের দুই বছরের বিবাহিত জীবন। এখনো যে খুব খারাপ তা নয় বোধহয়। অরিন্দমের ভালো রোজগার, যথেষ্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সবচেয়ে বড় কথা কোনো পরকীয়া প্রেম টেম নেই। অবশ্য একদিন অরিন্দমের করা একটা মেসেজ হঠাৎ চোখে পড়ে যায় তিথির। কোনো এক সুপর্ণা নামের মহিলাকে অরিন্দম লিখেছে 'কেমন আছিস সুপর্ণা? বিয়ে থা করে সুখি সংসার? তবে সত্যিই কি আমরা সুখি? না আমার মতো সবাই সুখি থাকার অভিনয় করে যায়। মাঝে মাঝে ভালো লাগে না রে। কবে আসছিস দিল্লি থেকে? দেখা করিস। হাতে হাত রেখে কিছুক্ষণের জন্য সবকিছু ভুলতে চাই।' হয়তো শুধুমাত্র বন্ধু বলেই তিথিকে মেসেজটা লুকানোর আলাদা করে কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনি অরিন্দম। অথবা পৃথিবীর সবচাইতে চালাক মানুষের মতন অরিন্দমেরও এটা অসাবধানতায় করে ফেলা ভুল একটা। তবে সেই ভুলের কোনো খেসারত দিতে হয়নি অরিন্দমকে। তিথি একবারও জিজ্ঞাসা অবধি করেনি অরিন্দমকে যে কে এই সুপর্ণা। তবে মাথায় গেঁথে ছিল ওই কথাগুলো। অরিন্দম তাহলে সুখি থাকার অভিনয় করছে? কেন? আকর্ষণ চলে গেছে? না তিথির নিজের কোনো খামতি? বোঝেনি তিথি। সেই অনিশ্চয়তা থেকেই হঠাৎ অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিল তিথি। অথচ খুব সামান্য ঘটনা। একদিন বাড়ি এসে দেখে অরিন্দম আগে এসেছে। আলো নিভিয়ে শুয়ে আছে। গায়ে ধুম জ্বর। কেউ নেই বাড়িতে। ভীষণ মায়া হল তিথির। আর নিজের ওপর রাগ।

এতটা কেয়ারলেস সামান্য একটা চাকরির জন্য? তাও ওই লোকটার প্রতি, মা বাবার পর যে তাকে একটা নতুন জীবন দিয়েছে? অর দ্বিধা না করে এক মাসের মধ্যে ছেড়ে দিল চাকরিটা। অরিন্দমের খেয়াল রাখবে বলে।

অরিন্দম একটা কথাও বলেনি। বলার কথাও না। তার যা রোজগার তাতে একটা পয়সাও তিথির থেকে নেওয়ার দরকার পড়ে না। তবে খুশি হয়েছিল মনে মনে।

কিচ্ছু ভোলেনি তিথি। আর যখন দুবছরের প্রতিটি দিন ছবির মতো মনে গেঁথে আছে তখন কালকের কথাই বা ভুলতে পারে কি করে।

শুরু হয়েছিলো পুজোর সময় মা বাবার বাড়ি যাওয়া নিয়ে। অমরেশবাবুর বহুদিনের ইচ্ছে পুজোর সময় মেয়ে জামাই দুদিন আসানসোল থেকে এসে কলকাতায় তিথিদের বাড়ি থেকে যায়। অরিন্দমের একদমই ইচ্ছে নয়। তিথি রীতিমতো রিকোয়েস্ট করেছিল অরিন্দমকে। 'চল না গো এত করে বলছে বাবা। আগের বছর বেড়াতে চলে গেছিলাম। এবার যদি এখানে থেকেও না যাই বাবার খারাপ লাগবে খুব।'

'তুমি তো জানো তিথি সারা বছরের মধ্যে এই দু-একটা দিন মাত্র ছুটি। এইসময় আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না।'

'জানি সোনা। শুধু জানি নয় ফীল করি তোমায়। যদি দুদিন না পারো একটা দিন অন্তত। দেখ বাবা মা তো এটা জানে যে আমার খুব ইচ্ছে যাওয়ার। এখন যদি না যাওয়া হয় ওরা বুঝতেই পারবে তোমার ইচ্ছে নেই বলে যাওয়া হল না। ওদের খারাপ তো লাগবেই প্লাস তোমাকেও খারাপ ভাববে। যেটা আমি চাই না একদম।'

উত্তর না দিয়ে অরিন্দম হেসে ফেলায় খুব অবাক হয়েছিল তিথি।

'হাসলে কেন?'

'না কিছু না।'

'প্লিজ বল।'

'আরে নয় গো কিছু।'

আদুরে হয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল তিথি। 'না বললে কিন্তু আগামী তিনদিন উপোষ। লাঞ্চ, ডিনার আর ডিনারের পরেও। সামলাতে পারবে তো? নাও শিগগির বল এখন।'

'উফফ। এমন কর না তুমি। কিছুই না। আমাকে খারাপ ভাবার ক্ষমতা তোমার মা বাবার কোনোদিনই হবে না। সেই জায়গাটাই ওনাদের নেই। বা বলতে পারো আমি রাখিনি।'

খুব অবাক হয়ে গলা থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়েছিল তিথি। 'এমন কেন বলছ?'

'কিছু না। ওসব কথা বাদ দাও এখন।'

'না বলতে হবে। শুনতে চাই আমি।'

এবার অরিন্দমের গলায় স্পষ্ট বিরক্তি।

'উফফ। সব কিছুতে জোর কর কেন? আর বলবই বা কি আর বলার আছেটাই বা কি? তোমার চেনা কোনো ছেলে সব জেনেশুনে দুজনের হাতে ইয়ে হওয়া মেয়ে কে বিয়ে করতে চায় বল তো? এরপরে ওনাদের আর কিছু বলা বা আমাকে খারাপ ভালো ভাবার মুখ থাকে কি? তুমি স্বচ্ছন্দে বাবাকে বলে দাও যে আমি চাইছি না তাই যাওয়া হবে না। এখন টুক করে এক কাপ চা নিয়ে এসো।'

সত্যিই বিশ্বাস হচ্ছিল না তিথির। বিয়ের দু বছর পরেও লোকটার মনে এটা রয়ে গেছে? এটাই তাহলে অরিন্দমের আক্ষেপ? আবেগের বশে আর কম বয়সের ভালো লাগা থেকে নেওয়া একটা সিদ্ধান্তকে বয়ে বেড়াচ্ছে অরিন্দম? তবে কি এইজন্যই হাজারবার

অনুরোধের পরেও বাচ্চা নেওয়ার ব্যাপারে এখনো এতটুকু আগ্রহী নয় অরিন্দম? রাতের পর রাত অভিমান করে কান্নাকাটি করলেও সে জল অরিন্দমকে গেলাতে পারেনি। আর সেজন্য এতগুলো দিন তিলে তিলে নিজেকে শেষ করেছে তিথি। তবু একটাও রাগের কথা বলেনি অরিন্দমকে। ভেবেছিল হয়তো এখনো বাচ্চার দায়িত্ব নিতে তৈরি নয় অরিন্দম। কিন্তু এখন তো পরিষ্কার হয়ে গেল, বিয়ের প্রথম আকর্ষণ চলে যাওয়ার পর তিথির দায়িত্ব নিতেই আর তৈরি নয় অরিন্দম। তবু ভালো, দেরিতে হলেও অবশেষে নিজের মুখে বলেছে তো।

বাবা ঠিকই বলেছে খারাপ সময়ে ভগবানের মতোই এসে তিথির বাড়ানো হাতের মধ্যে একটু উপকার ঢেলে দিয়েছিল অরিন্দম। তিথি সেটাকেই একটা রক্তমাংসের মানুষের হাত ভেবে ভরসা করে উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল।

'কি ভাবছিস রে মা?' বাবার কথায় চমক ভাঙল তিথির।

'কিছু না বাবা।'

'হ্যাঁ রে আর কিছু ভাবিস না। যা কিছু ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নে। এত সামান্য কারণে ছাড়াছাড়ি করলে পাঁচজন পাঁচ কথা বলবে। কি উত্তর দেব বল। তোর মা আর আমার দিকটাও ভেবে দেখ একবার। এমনিতেই তো তোর জীবনে অলরেডি একটা...।'

পাঁচ দশ সেকেন্ড চুপ করে মাথা তুলল তিথি। 'ঠিকই বলেছ বাবা। আর যাই হই অকৃতজ্ঞ হতে পারবো না। আমি কিচ্ছু ভুলিনি আমার খারাপ সময়ে তোমরা কিভাবে আমার পাশে ছিলে। জাস্ট আর একটা হেল্প করতে হবে এই লাস্ট টাইম।'

বুকের মধ্যে থেকে যেন পাহাড় নেমে গেল অমরেশবাবুর। 'এভাবে বলছিস কেন মা? বাবা কি মেয়েকে সাহায্য করে? এটা তো তার কর্তব্য। বল কি করতে হবে?'

একবার রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে মাকে দেখল তিথি। তারপর শুকনো ঠোঁটটা একবার জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলল—'অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো ব্যাগ হয়ে গেছে বেরনোর সময়। আর জানো তো চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছি। তাই যদ্দিন না একটা সস্তার বাড়ি ভাড়া পাচ্ছি এই ব্যাগগুলো একটু রেখে যেতে পারি এখানে?'

গ্রহণ

শুক্লা মালাকার

কুকুরগুলো সারারাত চিৎকার করেছে। সিঁথির মোড়ের খানিক আগে একটা গলিতে যে নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরি হচ্ছে শহিদুল সেখানে থাকে। মুর্শিদাবাদের ছেলে, এক বছর আছে। এখনো কলকাতার রকমসকমে পুরোপুরি ধাতস্থ হয়নি। কুকুরের চিৎকারে বারেবারে উঠে উঠে দেখছে। ইটবালি রড পাথর চারদিকে ছড়ানো। চুরি হতে কতক্ষণ? বালি গাদায় চার-পাঁচটা কুকুর শুয়ে থাকে। শহিদুল তাড়ায় না। অচেনা শহরের অজানা রাতে ওরাই ভরসা। বেশি হলে খাবারও দেয় মাঝে মাঝে।

শেষবার যখন উঠতে হল অন্ধকার আবছা হয়ে আসছে। চারদিক ভালো করে দেখে আবার শুল। ঘুমিয়ে কাজ নেই। মিস্ত্রি মজুরদের হইচই শুরু হবার আগেই রান্না চান সেরে নেয়। শুয়ে শুয়ে গ্রামের কথা ভাবছিল। বউটা এতক্ষণে উঠে পড়েছে। সারাদিন গাধার মতো খাটে তবুও মায়ের গালিগালাজ শোনে। চার বছর বিয়ে হয়েছে এখনো ছেলেপুলে নেই তাই মায়ের এত রাগ। চোখটা লেগে এসেছিল। অনেক মানুষের হইচই চেঁচামেচিতে লাফিয়ে বেরোল। বালির গাদার দিকে তাকিয়ে দেখে একগাদা মানুষ ভিড় করে আছে। দেখেশুনে কেমন ভ্যাবলা মতোন হয়ে গেল শহিদুল। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সুন্দর কাঁপড় পেঁচানো একটা কচি বাচ্চা, কুকুরগুলো ঘিরে রেখেছে। বাপের জন্মে এমন কাণ্ড দেখেনি শহিদুল। সে হাঁ করে বাচ্চাটাকে দেখছে। মায়ের মন কি পাষাণ। নাকি মা টা রাক্ষসী? কেউ এগোলেই কুকুরগুলো দাঁত খিঁচোচ্ছে। কে একজন শহিদুলকে বলল—তোমার কুকুরগুলোকে একটু সরাও না বাপু। সে বলতে পারল না কুকুরগুলো তার না। সাহস করে এগিয়ে গেল। কুকুরবাহিনী তাকে কিছুই বলল না। দমবন্ধ করে ফেলেছে ভিড়, শহিদুলও। খাবার দেবার সময় যেভাবে কথা বলে সেভাবে কথা বলতে বলচে নিচু হয়ে বাচ্চাটাকে তুলে নিল। কুকুরগুলোও যেন নিশ্চিন্ত হল। যে যার মতো ছড়িয়ে গেল। এবার সবাই ঘিরে ধরেছে শহিদুলকে। নানা মুনির নানা মত, নানা আলোচনা। শহিদুল কোলের একতাল নরম মাংসপিণ্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার বউ বাচ্ছা পায় না বলে কেঁদে ভাসায়, আর আল্লাহ যাকে দিয়েছে কি অনায়াসে ফেলে দিয়ে গেছে সে। পুলিশকে খবর পাঠানো হল। কেউ একজন দুধ এনেছে। ডাক্তার ধরে আনল অন্য কেউ। পরীক্ষা করে তিনি বললেন, সব ঠিকঠাক। এক মহিলা বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। শহিদুলের চোখের সামনে মা-বউয়ের হাসিমুখ। উঠোনময় টলমল করছে কচি দুটো পা।

সবাই চলে গেছে। থানায় নিয়ে গেছে বাচ্চাটাকে। শহিদুল ইঁটের পাঁজার ওপর নিঝুম বসে আছে। চাঁদপানা মুখটা দেখা থেকে বাপ হওয়ার ইচ্ছেটা কেবল ঘাই দিচ্ছে। নিয়মকানুন অনেক। সই-সাবুদ করে তবেই ওকে পাওয়া যাবে। বউটাকে ভালো খাওয়াপরা, একটু সঙ্গ কিছুই দিতে পারে না। বাচ্চাটা দিতে পারলে অপরাধ বোধটা কমত।

অনেক আশা নিয়ে বিকেলে থানায় গেল সে। কোথায় থাকে, পরিবারে লোক কজন, রোজগার কেমন, এমনি আরো অনেক কিছু জানতে চাইল। বাচ্চাটাকে কেন নিতে চাইছে জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলল শহিদুল। তাদের ঘরে যে একটা বাচ্চার খুব দরকার সেটা ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করল। ওর আকুতিতে অফিসারের মন নরম হয়েছিল বোধহয়। একটা পেপারে কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে লিখে দিল। হাই মাদ্রাসায় এইট ক্লাস পাশ শহিদুল লিস্ট দেখে হাতের প্ল্যাস্টিক প্যাকেট থেকে আধারকার্ড আর ভোটারকার্ড বের করে দিল। অন্য কাগজ গ্রাম থেকে এনে দেবে। মনে হিলহিলে খুশির বাতাস।

—কি নাম? শহিদুল—কাগজপত্র দেখে চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল অফিসার।

—আরে এটা দেখি...। ভাগ এখান থেকে। তোদের এক একটা পয়জন! বাচ্চা নিতে এসেছে। তাও আবার মেয়ে। বড় হলে দিবি তো বেচে, না হলে রেপ করে মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিবি। একদম ভ্যানতারা করবি না। পালা।

•

শিলঙ ভ্রমণ

কাকলি চট্টোপাধ্যায়

সবুজ স্বর্গোদ্যানে মেঘপরীদের আনাগোনা...সূর্যটা পশ্চিমের পাহাড়কে ছুঁতে না ছুঁতেই ঝুপ করে সন্ধে নেমে আসে। শিলঙের রাস্তাঘাট দার্জিলিঙের মতো এত সরু নয়। গৌহাটি থেকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে পাহাড়ি পথ চলে গেছে একশ তিন কিলোমিটার দূরে শিলঙে। গৌহাটি হল উত্তর-পূর্ব ভারতের মূল তোরণদ্বার।

গৌহাটি থেকে ঘণ্টাদেড়েক গিয়ে বাসটি নঙপোহ্ নামক একটি জায়গায় থামে। চা পানের বিরতি পর্ব চলে। বাসে যেতে যেতেই বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টির জমাট দেওয়াল ভেদ করে ওপাশে কিছু দেখা যায় না।

আধ ঘণ্টা পরে থেমেও গেল, এ যেন এক অভিমানী মেয়ে। এই তার দুঃখ স্রোতে আকুল হয়ে ভাসা আবার পরক্ষণেই অভিমান ভুলে হেসে ওঠা। পথের দুপাশে সতেজ সবুজ পাহাড় আর অজস্র ঝোরা।

১৮৬০ সালের জয়ন্তিয়া বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত এখানকার রাস্তাঘাট এমন উন্নত মানের ছিল না। তৎকালীন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের অনুমোদন ক্রমে সত্তর মাইল লম্বা, দশ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি করা হয়। তখনকার দিনে বাজার দরে খরচ হয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। সেই রাস্তায় তখন গরু ও ঘোড়ার গাড়ি চালানো হত। শোনা যায় হুগলী জেলার জনাই গ্রামের অধিবাসী গোলাম হায়দার ১৮৪৯ সালে জীবিকার সন্ধানে খাসি পাহাড় চলে আসেন। কয়েক বছর চেরাপুঞ্জি (সোহরা) সহ নানা জায়গায় ঘুরে ১৮৬৪ সালে শিলঙে পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর 'গোলাম হায়দার অ্যান্ড সন্স' কোম্পানির উদ্যোগে ১৮৮৭ সালের ৬ নভেম্বর সর্বপ্রথম শিলঙ থেকে গৌহাটির রাস্তায় ঘোড়ায় টানা টাঙ্গার প্রচলন হয়। তখন মাথাপিছু ভাড়া ছিল তিরিশ টাকা এবং শিশুদের পনেরো টাকা। ১৯০৬ সালে ঘোড়ায় টানা পরিবহনকে বিদায় জানিয়ে কোম্পানি মোটরযান চালু করেন। গাড়িতে তখনও নম্বর লাগানোর চল ছিল না। রানী ও মহারানী নামে দুখানা মোটরযান নিয়মিত চলাচল করত।

শিলঙে পৌঁছানোর আগে 'উমিয়ম' লেক-এর শোভা দেখে বিস্ময় জাগে। চারিদিকে পাহাড়ঘেরা বৃক্ষ-গুল্ম শোভিত এই অনিন্দ্যসুন্দর হ্রদের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। এখান থেকে মাত্র ষোলো কিলোমিটার দূরেই পুলিশ বাজার, যা শিলঙের প্রাণকেন্দ্র।

শিলঙের আয়তন প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার বর্গ কিলোমিটার, সাতটি জেলায় বিভক্ত। এখানকার মানুষজন মূলত খাসি, জয়ন্তি, গারো সম্প্রদায়ের। ১৯৬৫ মিটার উচ্চ শিলঙ পিকে উঠলে ছবির মতো সুন্দর সাজানো শৈলশহরটি ওয়াচ টাওয়ারে দেখা যায়। অদূরে পাহাড়ি সবুজ মঞ্চে মেঘ-পরীরা কী অপূর্ব নৃত্য-নাটকে আসর জমিয়ে রেখেছে।

শিলঙের অপর এক অপূর্ব দ্রষ্টব্য বস্তু হলো এলিফ্যান্ট ফলস। সারাক্ষণ কলকল, ছলছল, ঝরঝর কলতানমুখর এলিফ্যান্ট ফলস, যেন কোনো এক চপলা কিশোরী সারাটা ক্ষণ নাচে, গানে, গল্পে মেতেছে...এক অপার্থিব ভালো লাগায় মন ভরে যায়। মনে হয়, ওই ঝর্ণারও যেন প্রাণ আছে। ছোঁয়ায় আমিও প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি। ভাবি...এই তো বেঁচে আছি। এদের জন্যই তো বেঁচে থাকা। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে ঝর্ণাটা ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেছে। প্রতিটি সিঁড়ির বুকে আছড়ে পড়ে তার জীবনের উপকথা।

এখানে দেখার মতো বিশাল বড় ডন বসকো মিউজিয়াম, এর আর একটি নাম ক্যাপ্টেন উইলিয়াম সাংমা স্টেট মিউজিয়াম। এরপর লেডি হায়দরি পার্ক, শিলঙ গলফ্ কোর্স, একসময় এই বিরাট গলফ্ কোর্সটি পূবের 'গ্লেন এগেল' বলে পরিচিত, সবুজ গালিচায় বিকেলের নরম হলুদ আলোয় বড় বেশি মায়াময়।

সন্ধের আবছা অবগুণ্ঠিত রূপে অনন্যা শিলঙ সুন্দরী, চুমকি বসানো আঁচল পেতে অভ্যর্থনা জানায়। মহাশূন্যের নক্ষত্রমণ্ডল যেন ভালোবেসে পাহাড়ের উপত্যকায় নেমে এসেছে। বাজার এলাকাতে প্রাণের শেষ স্পন্দন কিছু বেশিক্ষণ জেগে থাকে। মাঝে মাঝেই আকাশ কাঁপানো বিদ্যুতের চমক আর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির ঝিরিঝিরি শব্দে অস্তিত্ব জানান দেয়। চারিদিক খুব তাড়াতাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে আসে। অদূরে কোনো কুকুরের নিঃসঙ্গ ডাক, নিস্তব্ধতাকে আরও গাঢ় করে তোলে। মেঘের কম্বল গায়ে মহাকাশও ঘুমিয়ে পড়ে। হোটেলে আমরাও কম্বলের ওম পেতে তাড়াতাড়ি বিছানায় ঢুকে পড়ি।

শিলঙে অবস্থানকালে রোজই একবার করে ওয়ার্ড লেকে যাওয়া যায়। পাইনগাছ বেষ্টিত এই কৃত্রিম লেকের জলে নৌকাবিহার একটি প্রমোদকর স্থান। এককালে এর নাম ছিল হপকিনসনের পুকুর। পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে আসামের তৎকালীন কমিশনার কর্নেল হপকিন্‌স এটা তৈরি করেছিলেন। পরে স্যর উইলিয়াম ওয়ার্ড কমিশনার হয়ে এলে এটিকে আরও বড় এবং উন্নত করা হয়, তখন থেকেই এর নাম হয়ে যায় ওয়ার্ড লেক।

শিলঙ পিকে উঠলে রবীন্দ্রনাথের দুটি বাড়ি দেখা যায়। ১৯১৯ সালের অক্টোবরে কবিগুরু যে বাড়িটায় ছিলেন, সেটি এখন মেঘালয় সরকারের আর্ট অ্যান্ড কালচার বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। অপর বাড়িটি 'জিৎভূমি', এই বাড়িতে ১৯২৩ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। সম্ভবতঃ এখানেই তিনি 'রক্তকরবী' লিখেছিলেন। বাড়িদুটি দেখতে দেখতে অনিবার্যভাবে তাঁরই কবিতার লাইন মনে পড়ে...'চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই'।

অনেকে বলেন, নৈসর্গিক বৈভবের দিক থেকে শিলঙ দার্জিলিঙকেও ছাড়িয়ে যায়।

এলিফ্যান্ট ফলস কিংবা উমিয়ম লেকের সামনে দাঁড়ালে সেকথার যথার্থতা অনুভব করা যায়।

শিলঙ থেকে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব প্রায় ছাপ্পান্ন কিলোমিটার। বত্রিশ কিলোমিটার একনাগাড়ে দৌড়ে বাসটা যেখানে তার প্রথম নিঃশ্বাস ফেলে তার নাম মৌডক। চেরাপুঞ্জির প্রথম দর্শনীয় স্থান এবং এতই তার মনোরম দৃশ্য যে...প্রথমেই মন বলে, তোমার কাছে এত কষ্ট করে আসাটা সার্থক।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এসে পৌঁছালো রামকৃষ্ণ মিশনে। ১৯৩১ সালে এখানকার মেইন বিল্ডিং-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু, কিন্তু তার আগে ১৯২৪ সালে শ্রীহট্টের স্বামী প্রভানন্দ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

অপর এক দ্রষ্টব্য বস্তু নক্ কালিকাই জলপ্রপাত। ১৭৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন এই প্রপাতের নীলাভ জলরাশি। এটি ভারতের দ্বিতীয় উচ্চতম জলপ্রপাত।

এরপরের গন্তব্য মৌট্রপ, এখানের একটি পাহাড়—চূড়ার নাম জায়েন্ট ক্রনিকল বাস্কেট। ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখা যায় শেলা রোড চলে গেছে বাংলাদেশ সীমান্তে। বামদিকে সুরমা নদী ও ডানদিকে থারিয়া নদী। সামনে লাইমস্টোন পাহাড়—ইছামতী।

লাইমস্টোন পাহাড়ের মাথায় জমা মেঘ, সেখান থেকে সূর্যের আলো পাহাড়ের রূপোলী শরীরে পড়ে তার সৌন্দর্য দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে। এরই মায়ায় একে একে ইংরেজ, ফরাসি, গ্রিক, পোর্তুগিজ, আর্মেনিয়ান বণিকরা এই পার্বত্যরাজ্যে বাণিজ্য করে যান। খাসি পাহাড়ে ব্রিটিশ সরকার ঘাঁটি গড়ার অন্তত তিরিশ বছর আগে হেনরি ইংলিশ অ্যান্ড কোং, এখানেই ব্যবসা জমায়।

চেরাপুঞ্জির বাজার এলাকা বেশ জমজমাট। স্থানীয় চেরিফুলের মধু বিখ্যাত। ঘরে ঘরে ভরভরন্ত কমলালেবুর গাছ সৌন্দর্য বাড়ায়।

চেরাপুঞ্জির সর্বশেষ দ্রষ্টব্য স্থানটির নাম হলো মওসমাই ফলস্। পাহাড়ের মাথায় মাথায় ধূসর মেঘমালা, সেখানে মেঘ ও রোদের লুকোচুরি খেলা চলে অবিরাম।

ফিরে আসার দিন আমাদের সাথে সাথে প্রকৃতির মুখও ভার। চারপাশের সেই থমথমে অনিন্দ্যসুন্দর মেঘরাশির অপরূপ শোভা আর তাকে ঘিরে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যানুভূতির কথা চিরকাল মনের মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করবে...তাই তো সে মেঘের আলয়, মেঘালয়।

দেখিয়া এলেম পর্বতমালা দেখিয়া এলেম সিন্ধু

বিজলী শীল

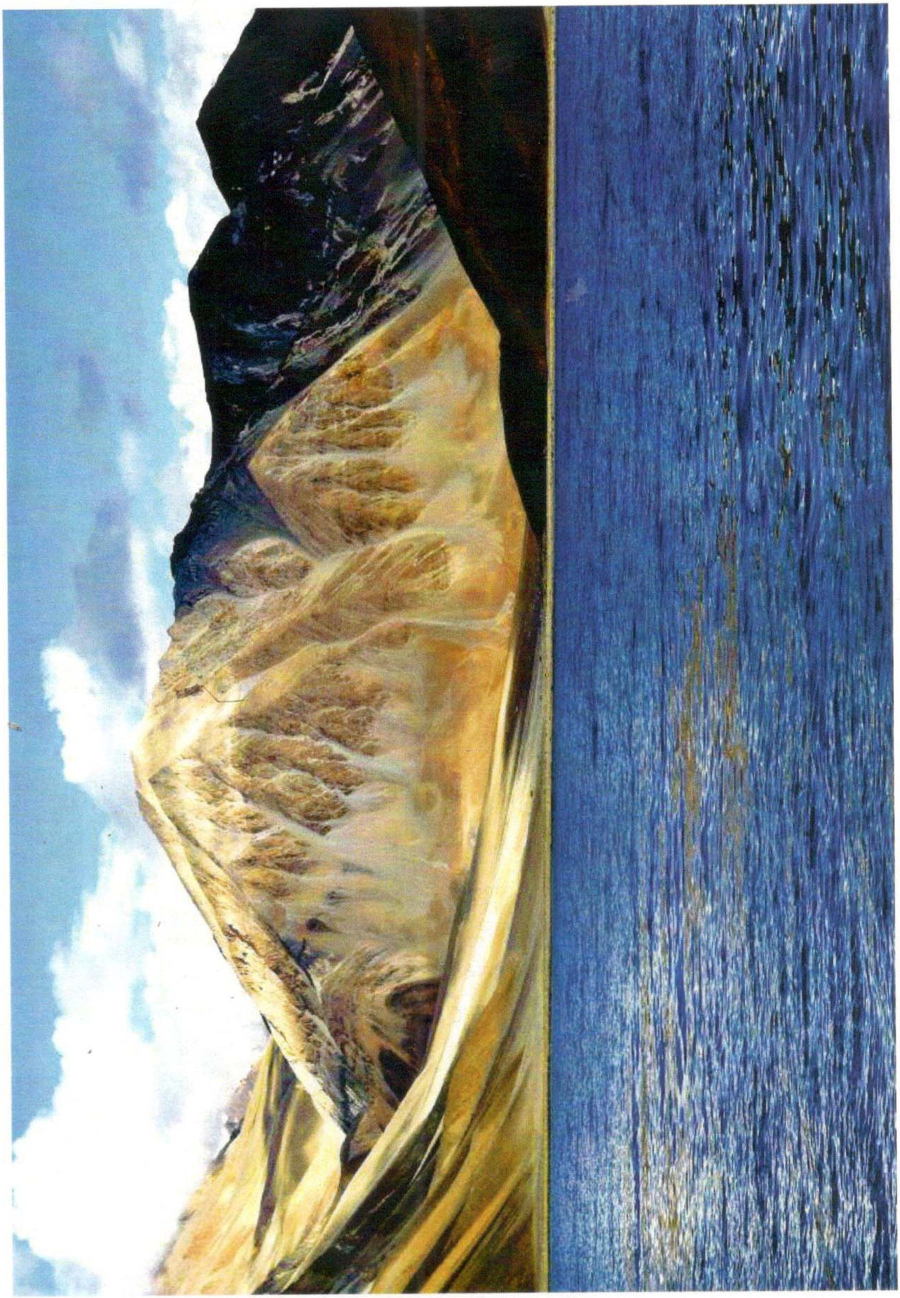
লাদাখের ডাইরি ঃ Noted your breath you are entering LADAKH কথাটির মধ্যে সচেতনভাবে শারীরিক সুস্থতার কথা জানানো হয়েছে। ভয়ঙ্কর সুন্দর লাদাখ ভ্রমণ করতে গেলে যথেষ্ট সচেতন ও সাবধান হতে হবে ভ্রমণার্থীকে। নইলে সমূহ বিপদ।

লাদাখ শব্দের একটা সুন্দর মানে আছে—'লা' কথার অর্থ গিরিবর্ত্ম আর 'দাখ' শব্দের অর্থ দেশ। অর্থাৎ গিরিবর্ত্মের দেশ। সত্যি এত পাহাড়ের বৈচিত্র্য জানি না আর কোথায় দেখা যায়। লাদাখ গেলে ইতিহাস ও ভূগোল দুটোই মিলেমিশে মনে জায়গা খোঁজে। এত বৈচিত্র্য, এত রঙ, এত বরফ সব কিছু নিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান পাহাড়গুলির আভিজাত্যই অন্যরকম। তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলা সিন্ধু নদ তো বটেই অন্যান্য বহু নদ ও নদীও।

১৬ জুন ঃ অনন্যা ট্রাভেল ছিল এই ভ্রমণের কর্ণধার। রাত সাতটা চল্লিশ মিনিটে 'কালকা' মেলে আমরা এসি থ্রি টিয়ারে চড়ে বসলাম। এই কদিনের প্যাচপেচে গরম পাঁচ মিনিটেই উধাও। আমাদের ছয়জনার মধ্যে দু-জোড়া স্বামী-স্ত্রী ও আমরা দুজনে একই সংস্থার সহকর্মী। এই ভ্রমণের পূর্বে আমাদের বেশ কিছু বিধি নিষেধের বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল এগুলো না মানলে অসুবিধায় পড়তে হবে আর তখন মানা না শুনলে ফেরত পাঠানো হবে। যেমন সোয়েটারের ওপর জ্যাকেট, কান-মাথা-ঢাকা দেওয়া টুপি। পায়ে জুতো মোজা। উচ্চতাজনিত শ্বাসকষ্টের উপশমের জন্য কর্পূর। অক্সিজেনের সিলিন্ডার ইত্যাদি। ঠাণ্ডা গরমে বার বার না যাওয়াও তার মধ্যে ছিল। মিঃ বিশ্বাস ও তার স্ত্রী দুজনেই সজ্জন। কিন্তু মিঃ বিশ্বাস আর সবার মতো পোষাক পরিহিত ছিলেন না। হাফ প্যান্ট, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জিই ছিল তার পোষাক। দৃষ্টিকটু লাগছিল, কিন্তু কিছু বলা তো যায় না। আমরা সবাই সচেতন ছিলাম যাতে অসুস্থ না হই। কিন্তু এই মানুষটি একেবারে উদাসীন ও কিছু বললেই নস্যাৎ করে দেবার জন্য উদগ্রীব। জনা পঞ্চাশ ভ্রমণার্থী সমেত আমরা যাত্রা শুরু করলাম।

১৭ তারিখ একটু বেলার দিকে কোনো একটা স্টেশনে নেমে মিঃ বিশ্বাস সাবান মেখে স্নান সেরে এলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। স্নান সেরেই এসি কোচে জমিয়ে খাবারদাবার খেয়ে জমিয়ে ঘুম দিলেন। কামরাগুলো খুব ঠাণ্ডা। বিশেষত মাথা আর কানে আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছিল।

১৮ জুনের খুব ভোরে আমরা চণ্ডীগড় পৌঁছালাম। তাড়াতাড়ি প্রাতঃরাশ সেরে টাটা ম্যাক্সি কারে চড়ে যাত্রাপথ শুরু করলাম। যাত্রা শেষ হবে রাত আটটা নাগাদ মানালিতে। প্রচুর যানজট কাটিয়ে রাত বারোটায় 'হোটেল সম্রাট'-এ পৌঁছলাম একরাশ



Pangong Tso Lake, Ladakh

ক্লান্তি নিয়ে। লাদাখ যাত্রায় কোনো একটা জার্নি গাড়িতে না এলে এ সৌন্দর্য বোঝা যাবে না।

১৯ জুনের মানালিতে একদিনের বিশ্রাম। খুব ভোরে উঠেই একটু ফাঁকা জায়গায় পাহাড় দেখতে গিয়ে দেখলাম ভালো বরফ জমেছে পাহাড়ের খাঁজে। খুব ভালো লাগছে চারপাশ। মাঝে মাঝে গাছের ফাঁক দিয়ে প্রভাত সূর্য আলো দিচ্ছে। প্রাতঃরাশ সেরে যে যার বেরিয়ে পড়লো কেনাকাটা করতে। বিকালে নামল বৃষ্টি। আমরা সবাই তড়িঘড়ি হোটেলে পৌঁছুলাম। কিন্তু মিঃ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী ফিরলেন অনেক রাতে ভীষণরকম বৃষ্টিতে ভিজে।

২০ জুন ভোর ছটায় আমাদের যাত্রা। গন্তব্য কেলং। পথে পড়বে রোটাংপাস। হাতে একটা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে মিঃ বিশ্বাস ছোটাছুটি করে ছবি তুলেই চলেছেন। গাড়ির প্রত্যেকে এত ছোটাছুটি করতে নিষেধ করছে। কিন্তু বারণ শব্দটা ওর অভিধানে নেই। দুপুরের খাওয়ার জন্য রাস্তার ধারে একটা পরিষ্কার জায়গায় গাড়ি থামালাম। এত প্রবল বেগে হাওয়া বইছিল যে গাড়িও নড়ছিল যেন। খুব তাড়াতাড়ি আমরা গাড়ির ভেতরে, কেউবা গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে কোনোমতে খাওয়া শেষ করলাম। মিঃ বিশ্বাসকে কিছুতেই গাড়িতে তোলা যাচ্ছে না। তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে কোথায় চলে গেল। বোঝা গেল সিগারেট খেতে। সিগারেট এখানে নিষিদ্ধ ভ্রমণার্থীদের জন্য। বিকালে কেলং পৌঁছলাম। মিসেস বিশ্বাসকে মিঃ বিশ্বাসের কথা জিজ্ঞেস করায় বলল শরীরটা একটু খারাপ লাগছে তাই শুয়ে আছে। বিকাল পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে আমাদের বিশ্রাম নিতে বলা।

২১ জুনের ভোর পাঁচটায় অন্ধকার থাকতে থাকতে আমরা লে লাদাখের জেলা শহরের দিকে যাত্রা করলাম। Tag lang-la-Pass, Bara-lacha-Pass দেখে হুহু করে আমাদের গাড়ি বিশেষ কোথাও না দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল। বিচিত্র পাহাড়ের রং, বিচিত্র গঠন, আর সাথে সাথে অধিকাংশ সময়ে তীব্র গতিতে, কখনও বা ধীর গতিতে সিন্ধুনদের গতিপথ দেখতে দেখতে আমরা চললাম। যথারীতি মিঃ বিশ্বাস ভিডিও করতে করতে চলেছেন। আমার শরীরটায় যেন অস্বস্তি উঁকি দিচ্ছিল। আমার কষ্ট হচ্ছিল। সাথে টীম ম্যানেজার ছিলেন আমার নাড়ির গতি প্রকৃতি দেখে আমাকে অক্সিজেনের মাস্কটা পরিয়ে অক্সিজেন দিলেন একটুখানি। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। একজন আর এস দিলেন একটুখানি। আমি একটু একটু করে খেতে লাগলাম। মিনিট দশেক পর আমি একেবারে ঠিক হয়ে গেলাম। আমার এই অবস্থায় আমি সেদিন দুপুরে কিন্তু খাবার খেলাম না। পরে শুনলাম অন্যান্য গাড়িতেও এরূপ অবস্থা কয়েকজনের হয়েছিল। কেউ কেউ বমিও করেছিল। সবার খাওয়া শেষ, সবাই গাড়িতে এসে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস পরিবারের দেখা নেই। ভীষণ হাওয়া, তীব্র রোদ্দুর। মিনিট দশেক পরে ওরা বাসে ফিরল। আমার কাছ থেকে কর্পূর নিয়ে শ্বাস নিচ্ছে দেখলাম। দুজনকেই দেখলাম বেশ চুপচাপ, জিজ্ঞেস করায় শরীরটা ভালো লাগছে না জানান। লে শহরে যখন গাড়ি পৌঁছল এতক্ষণ পাহাড়ের যে

রূপ দেখছিলাম এখন ঠিক তার উল্টো। বিচিত্র রং, বিচিত্র প্রকৃতি। বেশ রাতে লে পৌঁছলাম। 'হোটেল আবু'। রাতে খাবার ঘরে ওদের দেখলাম না। জিজ্ঞেস করে জানলাম মিঃ বিশ্বাস একটু অসুস্থ বোধ করছেন খাবার ঘরে দেওয়া হবে। ২২ জুন সবাই আমরা তৈরি হলাম সকালে লে শহরের দ্রষ্টব্য দেখতে যাব বলে। মিঃ বিশ্বাস সেই গায়ে গেঞ্জি ও তোয়ালে দিয়ে আমাদের সাথে বসে আড্ডা দিল। আমরা যেখানে পুরোদস্তুর উলেন জামাকাপড় জুতো মোজা পরে বসে আছি। মিসেস বলল ওরা ডাক্তার দেখাতে যাবে তাই আমাদের সাথে যাবে না। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তিব্বতীদের অধিকাংশ বসবাস বলে লে শহরটায় প্রচুর উঁচু উঁচু সুন্দর সুন্দর গুম্ফা দেখা যায়। আমরা সেসব দেখে হোটেলে ফিরলাম। আমি ওদের রুমে গেলাম কেমন আছে দেখতে। দেখি মিঃ শুয়ে আছে। কি ব্যাপার তোমার? আমি জিজ্ঞেস করায় সেই দুষ্টুমি হাসি হেসে বলল, দিদি শরীরটা ভালো লাগছে না গো। ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন। আমি জিজ্ঞেস করায় ওর স্ত্রী (যাকে আমি প্রথম থেকেই নব বলে ডাকতাম, ওর নাম নবনীতা) বলল কথা শুনছে না দিদি তুমি তোমার ভাইকে একটু বলে দাও যাতে ডাক্তার দেখায় কাল।

২৩ জুনের খুব ভোরে খারদুংলা পাসের উদ্দেশ্যে রওনা হবো। শুনলাম শেষরাতে মিঃ বিশ্বাস খুব অসুস্থ হওয়ায় ওকে মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওদের রুমে গিয়ে দেখি নব খুব কান্নাকাটি করছে। কী করা যাবে, আমরা বেরুবো এমন সময় আমাদের সাথে আরো একটা পরিবারের কথা লিখেছি সেই ডঃ বাবুর স্ত্রী মাথা ঘুরে পড়ে গেল। হাঁটুর নিচে মারাত্মক রকমভাবে কেটে গেছে। পরে শুনলাম চারটে সেলাই দিতে হয়েছে, অসাড় করতে হয়েছে জায়গাটা। মনটা ভালো নেই। আজ আমরা খারদংলাপাস আর দেখব (প্রাচীন) সিল্ক রুট। নুব্রার গেটওয়ে খারদুর। নুব্রা উপত্যকার ৫৩০০ মিঃ উঁচুতে খারদুংলা মানে শিবের বাসস্থান হিসেবে পরিগণিত। নুব্রা নদীর ওপর দিয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ মোটর যাবার অর্থাৎ গাড়ি যাবার রাস্তা। নিচ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে আপন মনে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর জায়গা। এসবই মিলিটারিরা দেখাশোনা করে। সুন্দর রাস্তা, লাইন দিয়ে বাইক আরোহীরা ছুটেছে লাদাখের ভয়ঙ্কর রূপ, অসাধারণ সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করতে। নুব্রা ভ্যালি জীবনে একবার দেখলে সে কখনো ভুলবে না। নদীর জল সরে গিয়ে সেই চড়ার ওপর অসাধারণ জ্যামিতিক মাপজোক করা আলপনা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। বিকালে হান্ডার ভিলেজে গেলাম দুই কুঁজ বিশিষ্ট উট দেখতে। সেখানে অনেকে উটে চড়ে চারপাশটা ঘুরে এল। পাহাড়ের রং এখানে ভিন্নতর, অপূর্ব দৃশ্যাবলী এখানে।

২৪ জুন সকাল আটটায় নুব্রাভ্যালি ছেড়ে আমাদের গাড়ি ছুটল লে-হোটেল আবুর দিকে। লে পৌঁছালাম বিকালবেলায়। গোটা হোটেল যেন স্তব্ধ, গাছপালাগুলোও যেন মাথা নাড়া ভুলে গেছে। ফিরেই কানাঘুষোয় শুনলাম গতকাল অর্থাৎ গতকাল সকালেই মিঃ বিশ্বাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পাছে আমরা নার্ভাস হয়ে পড়ি সেজন্য আমাদের জানানো হয়নি। ওর লাংসে জল জমে গিয়েছিল। হায় ঈশ্বর এ কি করলে

তুমি !কলকাতা থেকে বড় ছেলে ও অন্য একজন আত্মীয় এসেছে। মৃতদেহ বনগাঁয় নিয়ে যাবে বলে। ওরা বনগাঁর বাসিন্দা ছিল। খুব কষ্ট পেয়েছি সেদিন। তারপর সারাটা ট্যুর কেমন যেন একটা চাপা কষ্ট। কোনোমতে ওর মিসেসের সাথে দেখা করলাম। তার সেই বুকফাটা কান্না সহ্য করা কঠিন।

পরদিন খুব ভোরে ওরা বেরিয়ে পড়ল বডি নিয়ে প্লেনে বাড়ি ফিরবে বলে। সব কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে। আমি জানালার পর্দা ফাঁক করে দেখলাম। ওর সামনে যেতে পারিনি।

২৫ জুনে আমরা প্যাংগং লেক দেখতে বেরোলাম ভোর পাঁচটায় ভায়া চ্যাংলা পাস। একটা তরতাজা প্রাণবন্ত মানুষ যাকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে এই মানুষটার আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একজন সফরসঙ্গীকে এভাবে হারানোর জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। যেন ভাবতেও পারছিলাম না যে মিঃ বিশ্বাস আর নেই। ট্যুর যথীরীতি চলতে লাগল।

২৬ জুন, বাসের ঐ দুটো সিট ফাঁকা। বিশ্বাস পরিবার নেই। একজন মৃত, অন্যজন বাড়ি ফিরে গেছে কাঁদতে কাঁদতে। এরপর আমরা আরো সুন্দর ও আশ্চর্যজনক লেক দেখলাম। TOSOMO RIRI LAKE / CHHUMATHAI (HOT SPRING) বিকালে লে হোটেলে ফিরে এলাম। একজনের মৃত্যু আর সবাইকে সচেতন করে দিয়েছে। সবাই মোটামুটি সুস্থ ভাবেই ট্যুর সম্পন্ন করে যাচ্ছে।

২৮ জুন ঃ লে ছেড়ে কারগিলের পথে যাত্রা এই যাত্রা যে এত অসাধারণ আর অদ্ভুত হবে সেটা কল্পনারও বাইরে ছিল। 'মূলবেকে' প্রায় নয় মিটার উঁচু মৈত্রের বুদ্ধের চতুর্ভুজ মূর্তি, যেটা অনুমেয় কুষাণ যুগের। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিটি দেখে। একটু পরেই এক আশ্চর্য আলোয় ভরা পাহাড় দেখা দিল আমাদের নজরে। যেন সোনা তৈরি। এই তাহলে দ্য গ্র্যান্ড ভিউ অফ মুনল্যান্ড। চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ ও সোনার বরণ পাহাড়। পাহাড়ের নিচে দিয়ে তীব্র বেগে সিন্ধু এগিয়ে চলেছে জাঁসকর উপত্যকার দিকে। সিন্ধুনদের পান্না রং আর জাঁসকরের মাটি ধোঁওয়া ঘোলাটে রং। মিলিত হবার সময়ে দুজনে যেন অনেক দিন পর দেখা ও মিলন হলো এমন শান্ত রূপ। দুটো নদীর জলরেখা আলাদা। এরপর আমরা কারগিলের রাস্তা ধরলাম। বেলা একটায় কারগিল পৌছালাম।

২৯ জুন ঃ আমরা কারগিল থেকে শ্রীনগরের দিকে যাত্রা করলাম খুব ভোরে। অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছে। পথে দ্রাস, জোজিলা পাস নজরীভূত হলো মাত্র, মনের সাধ মিটলো না।

শ্রীনগরে পৌছানো মানে আমাদের দীর্ঘ ট্যুরের অবসান। আমরা কজনে মিলে শ্রীনগর থেকে প্লেনে দিল্লি হয়ে কলকাতায় ফিরে, বাকিরা জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস ধরে হাওড়া পৌছবে। সবই হলো, শুধু একটা মানুষ লে তে থেকে গেল। সে হয়তো অদৃশ্যভাবে আমাদের সাথে সমস্ত ভ্রমণটাই সম্পূর্ণ করেছে। ঈশ্বর এ পরিবারকে শান্তি ও স্বস্তি দিও।

ধর্মপ্রাণা নিবেদিতার ভারতদর্শন

অরুণকুমার সরকার

'নিবেদিতা' নামটি স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া নাম। তাঁর প্রকৃত নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডমগানন শহরের বংশগত অধিবাসী ছিলেন স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল ও তার স্ত্রী মেরী ইসাবেলা নোবেল। তাঁরা ছিলেন ধর্মপ্রাণ দম্পতি। একটি সুসন্তানের আশায় তাঁরা ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই প্রার্থনা জানাতেন। অবশেষে, ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর কোল আলো করে জন্মাল এক শিশুকন্যা। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা-মা সেদিন মুগ্ধ হলেন। ঠাকুমার নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে নাম রাখা হল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল।

মার্গারেট কোলে আসার আগে মেরী ইসাবেলা একদিন স্বপ্নাদেশ পেলেন, যে শিশু তাঁর কোলে আসছে, সে হবে মানবকল্যাণে এক নিবেদিত প্রাণ। তাই, জন্মের কয়েক মুহূর্ত আগে মা মেরী ইসাবেলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর, আমার সন্তান যদি নিরাপদে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তোমার চরণেই ওকে নিবেদন করব।' করেও ছিলেন তাই।

মার্গারেটের পিতা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। মার্গারেটের প্রথম লেখাপড়া এবং ধর্মশিক্ষা তাঁর ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমাকে ছেড়ে তিনি যখন মাবা-মা'র কাছে এলেন, তখন থেকে মার্গারেট যেন ছায়ার মতো বাবার সঙ্গে লেগে থাকতেন। বাবার মুখে ধর্মীয় বক্তৃতা শুনতেন। ধর্মীয় বক্তৃতা শুনতে শুনতে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন বাবার দিকে। বাবার কাজের মধ্য দিয়েই মার্গারেট নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করেন। বাবার কাছে তিনি এই শিক্ষা পান যে, মানব সেবাই হল ঈশ্বর সেবা। মৃত্যুকালে মেয়ের সম্পর্কে তিনি স্ত্রী মেরী ইসাবেলকে বলেছিলেন, 'ওর পথ খোলা রেখো'।

মাত্র দশ বছর বয়সে মার্গারেট পিতৃহারা হন। এরপর মানুষ হন মাতামহ হ্যামিলটনের কাছে। তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। তাঁর কাছ থেকেই মার্গারেট দেশপ্রেম, সমাজ ও মানবসেবার পাঠ পেয়েছিলেন।

বাবার এক ধর্মযাজক বন্ধুর মুখে মার্গারেট প্রথম ভারতবর্ষের কথা শুনতে পান। তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের সেবা চায়। এ কথা শোনার পর থেকেই ভারতবর্ষকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মায় মার্গারেটের মনে। চঞ্চল হয়ে উঠল তাঁর মন। বিশ্বের মানচিত্র বের করে খুঁজতে থাকলেন ভারতবর্ষের অবস্থান।

১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাস। মার্গারেটের বন্ধু ইসাবেল মার্গেসনের বাসগৃহে বিবেকানন্দ বেদান্ত ব্যাখ্যা করছিলেন। মার্গারেট তা শুনে মোহিত হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বিবেকানন্দ 'বিশ্বাসের' পরিবর্তে 'উপলব্ধি' কথাটির ওপর বারবার জোর দিচ্ছেন। আর মাঝে মাঝে আপন খেয়ালে 'শিব' 'শিব' বলে উঠছেন। বিবেকানন্দের মুখে তিনি আরও শুনলেন, 'প্রেমই ধর্মভাবের চরম উৎকর্ষ। একথা খ্রিস্টধর্মেও আছে, হিন্দুধর্মে তো আছেই। হিন্দুরা মনে করেন, শরীর আর মন এক, তৃতীয় পদার্থ আত্মার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।' এসব কথা শুনে মার্গারেট চমকে উঠলেন। কথাগুলি যেন তীরের মতো গেঁথে গেল মনে। তিনি অনুভব করলেন, নতুন এক সঙ্গীত তাঁর মনের ভেতর যেন বেজে উঠছে। দিশাহীন মার্গারেট খুঁজে পেলেন তাঁর পথ। সে কথা তিনি এক বন্ধুকে লিখেওছিলেন, ' Suppose he had not come to London that time, life would have been a headless dream, for I know I was wanting some-thing'।

১৮৯৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। জ্যোতির্ময় এক পুরুষের টানে পরিবারের সকলকে ফেলে সুদূর লন্ডন থেকে কলকাতা বন্দরে এসে নামলেন মার্গারেট। স্বামীজি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন অভিবাদন জানাতে। সেই বছরেই স্টার থিয়েটার হলে স্বামীজি মার্গারেটের পরিচয় করালেন। স্বামীজি মার্গারেটের পরিচয় দিলেন, 'ইংল্যান্ডের দেওয়া ভারতবর্ষকে একটি উপহার' হিসেবে। এরপর তিনি মার্গারেটকে বক্তৃতা করতে আহ্বান করলেন। মার্গারেট তাঁর ভাষণে বললেন, 'সেবা আমার ধর্ম, ভারত আমার দেশ'। তিনি আরও বললেন, 'আপনারা এমন এক রক্ষণশীল জাতি, যে জাতি দীর্ঘদিন ধরে সমগ্র জগতের জন্য আধ্যাত্মিক সম্পদ সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন।' সকলের সঙ্গে স্বামীজিও মুগ্ধ হলেন মার্গারেটের বক্তৃতা শুনে। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি বললেন, 'মার্গারেটের প্রাণ মহৎ, হৃদয় উদার ও পবিত্র। তাঁর এই প্রাণ তিনি ভারতবর্ষের সেবায় দিতে এসেছেন, গুরুগিরি করতে নয়।'ব্যাস। শুরু হল মার্গারেটের পথ চলা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এদেশের জনগণের সঙ্গে মিশে তাঁদের সুখ-দুঃখের ভাগিদার হয়ে গেলেন।

১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ। ব্রাহ্মমুহূর্ত। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যানবাটিতে দুটি আসন পাতা। একটিতে স্বয়ং স্বামীজি, আন্যটিতে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। বেজে উটল মঙ্গলশঙ্খ। স্বামীজি মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা শেষে স্বামীজি বললেন, 'আজ থেকে তোমার নাম হল নিবেদিতা'। আর বলেছিলেন 'আর দেরি নয়, এখুনি বসে পড়ো কালীর ধ্যানে। রক্তে চাই সিংহের শক্তি। তোমার ওপর আমার একশো ভাগ আস্থা। আমার স্বপ্নের ভারত তুমি গড়বে।' আমার শক্তি তোমাকে ঘিরে থাকবে। আমার যদি একখানা রুটি জোটে, জানবে তার আধখানা তোমার'। স্বামীজি আরও বললেন, 'ওদেশে তুমি কাজ করো বা নাই করো, বৈদান্তিক হইতে পারো বা নাই পারো, আমরণ আমি তোমার পার্শ্বে থাকিব—আমি তোমার নিকট শপথ করিতেছি'।

দীক্ষা গ্রহণের ঠিক আগ মুহূর্তে মার্গারেট যখন মা সারদাকে প্রণাম করতে গেলেন,

মা সারদা সেসময় সস্নেহে বলেছিলেন, 'এসো মা, বস, এটা তোমারই দেশ'। মার্গারেটকে তিনি কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। আর বলেছিলেন, 'তুমি আসায় আমার ভারী আনন্দ হয়েছে মা।' মার্গারেটের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'জীবনে জয়ী হও মা।' মা সারদার হাত মাথা স্পর্শ করতেই মার্গারেটের অন্তরে এক আলোর বন্যা যেন নেমে আসে। মার্গারেট সেদিন এক পরিপূর্ণ আনন্দ অনুভব করলেন। তারপর স্বামীজির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে হলেন নিবেদিতা।

স্বামীজি নিবেদিতাকে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিলে মনে খানিকটা দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন স্বামীজি তাঁকে সন্ন্যাস মন্ত্র দেবেন। কিন্তু দিলেন ব্রহ্মচর্য। স্বামীজি শুধু বলেছিলেন, 'তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক'। স্বামীজি হয়তো বুঝেছিলেন, সন্ন্যাস নিবেদিতার পথ নয়।

স্বামীজির প্রভাবে নিবেদিতার সেবাব্রত এবং আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। নিবেদিতা একদিকে যেমন পাশ্চাত্যবাসীর কাছে ভারতীয় সভ্যতার মহিমা তুলে ধরেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তিনি নিজ হাতে রাস্তা নর্দমা ইত্যাদি পরিষ্কার করেছিলেন। 'মানব সেবাই যে প্রকৃত ধর্ম' স্বামীজির এ কথা নিবেদিতা আজীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। বন্যাপীড়িত মানুষদের তিনি করুণাময়ীর মতো সেবা করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে সে সময় গোপালের মা-এর বিশেষ স্থান ছিল। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারের এক নিষ্ঠাবতী বিধবা। আজীবন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বালগোপালের উপাসনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি বালগোপালের দর্শন পেয়েছিলেন বলে, শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি 'গোপাল' বলে ডাকতেন। বৃদ্ধ বয়সে সেই মহা-আচারী গোপালের মা যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন নিবেদিতা তাঁকে নিজের বাড়িতে রেখে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন।

স্বামীজির মহাপ্রয়াণের পর বেলুড়মঠের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এরপরই নিবেদিতা সমাজসেবায় নিজেকে বেশি করে জড়িয়ে ফেলেন। আবার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে নিবেদিতার ধর্মোপাসনাগত সাযুজ্য ছিল। উভয়েই শক্তির আরাধনা করতেন। অরবিন্দ নিবেদিতাকে 'শিখাময়ী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উল্লেখ করেছেন 'লোকমাতা' হিসেবে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'ভগিনী নিবেদিতার জীবনকে জানা পৃথিবীর একটা বড় শিক্ষা'।

১৯০২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর নিবেদিতা একটি চিঠি লিখেছিলেন ম্যাক্লাউডকে। সে চিঠি থেকে জানা যায় যে, যেদিন স্বামীজিকে দাহ করা হয় (৫ জুলাই, ১৯০২) সেদিন সন্ধ্যায় স্বামীজির ব্যবহৃত বস্ত্রের একটি খণ্ড অলৌকিকভাবে নিবেদিতার কাছে উড়ে আসে। যদিও এর আগে নিবেদিতা একান্তভাবে ওই বস্ত্রখণ্ড চাইলেও শাস্ত্রীয় কারণে তাঁকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন স্বামীজি তাঁকে বঞ্চিত করেননি।

স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন প্রতিটি ভারত-সন্তানের জননী, সেবিকা ও বন্ধু

হয়ে উঠতে। নিবেদিতা কিন্তু গুরুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। নিবেদিতার কাছে ভারতবর্ষ হল এক পুণ্যভূমি। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষ তাঁর কাছে পুণ্যাত্মা। নিবেদিতা কখনও 'ভারতের প্রয়োজন', 'ভারতের নারী' বলতেন না। বলতেন, 'আমাদের প্রয়োজন', 'আমাদের নারী'। ভারতকে বলতেন 'এদেশ', আর ইংল্যান্ডকে বলতেন 'ওদেশ'। তাই তিনি ভারতের। তাঁর মতো আর কোনও বিদেশিনী ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, দুঃখ ও স্বপ্নকে এমন আপন করে গ্রহণ করতে পারেননি। বস্তুত, ভারতের জন্য নিবেদিতার আত্মনিবেদন এতটাই আন্তরিক, পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ ছিল, যাকে করে তাঁকে বিদেশিনী বলতেই অপরাধ বোধ হয়।

১৯০৪ সালের ১৭ মার্চ মিস ম্যাক্লাউডকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষে আসার আগে নিবেদিতা প্রখ্যাত হস্তরেখাবিদ কিরোকে (প্রকৃত নাম উইলিয়াম জন ওয়ার্নার) হাত দেখিয়েছিলেন। কিরো নিবেদিতার হাত দেখে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যু হবে ৪২ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে। নিবেদিতা চলে গেলেন ৪৪ বছর বয়সে। ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর শুক্রবারের সকাল ৭টায় দার্জিলিংয়ের রায় ভিলায় নিবেদিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে বলেছিলেন, 'তরণী ডুবছে, আমি কিন্তু সূর্যোদয় দেখব'। কিন্তু নিবেদিতা মৃত্যু শয্যায় যে সূর্যোদয় দেখতে চেয়েছিলেন, সে সূর্যোদয় কি আজও হয়েছে?

সূত্র : ১. উৎসব পত্রিকা।
২. ভারতের নিবেদিতা—রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার।
৩. বিভিন্ন সংবাদপত্র।

বাংলা গদ্যের উত্তরাধিকার

পিনাকীরঞ্জন গুহ

গদ্য আমার ভালো লাগার জায়গা, আর কবিতা অবশ্যই ভালোবাসার। লিখেছি মাত্র সাকুল্যে গোটা পঞ্চাশ। সংবাদপত্রে যুক্ত থাকার কারণে প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও বিস্তর গদ্য লিখতে হয়েছে। সব মিলিয়ে সবটাই আমার লেখালিখি, অর্থাৎ আনন্দের জন্য—শ্বাস-প্রশ্বাসের বিস্তীর্ণ এলাকা। এক কথায় স্বস্তির খোলা মাঠ। সেখানে অবাধ বিচরণে কেউ কখনও আমাকে বাধা দেয়নি। তবে, সব গদ্য রচনার জন্যই যে মনে মনে তৃপ্ত হয়েছি, এমন নয়। গদ্য লিখতে বসে নিজেকে ভাঙাচোরার ব্যাপারটা খুবই থাকে। থাকে একরকম মজাও। মায়াবী মজা। যে কারণে আমি নিজের কাছেই নিজে ঋণী। এই কৃশানু পত্রিকার জন্যও লিখতে হয়েছে বিস্তর গদ্য। কখনও সম্পাদকের তাড়ায় কিংবা ভালোবাসায়। সেই প্রয়াত দীনেশচন্দ্র সিংহের ভালোবাসার টান গভীরে এখনও অনুভব করি।

দীনেশ সিংহ সহ জনাচারেক দাদার সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'বাঁক' পত্রিকা। সকলের স্নেহ এবং প্রশ্রয়ে সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই গল্প ছিল আমারও।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি লেখক-কবিদের অগতির গতি। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-প্রেমেন্দ্র মিত্র-তারাশঙ্করকে যদি একপাশে সরিয়ে আনা হয়, তবুও রবীন্দ্রনাথ থেকে যাচ্ছেন দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ, স্থিতধী সেই মানুষটিকেও কলম তুলে নিতে হয়েছে গোরা, যোগাযোগ, বউ ঠাকুরাণীর হাট, চার অধ্যায় কিংবা ঘরে বাইরের মতো উপন্যাস রচনার জন্য। পাশাপাশি লিখতে হয়েছে প্রায় আড়াইশোর মতো অবিস্মরণীয় গল্প। সঙ্গে বেশ কয়েকটি নাটকও। বিশ্বকবি পরিচয়ের কথা মনে রেখেই যেগুলি বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক অবস্থান প্রায় খণ্ডিতই থাকে।

বাংলা সাহিত্যের আদন্ত্য পর্যাবেক্ষণের সুবাদে গদ্যের এলাকাটি অবশ্যই সম্প্রসারিত। সম্ভবত সেইদিকে তাকিয়েই বিশিষ্ট লেখক-সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' লিখতে হয়েছে কিংবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প শীর্ষক অসাধারণ বইটি। নেহাত কূটকচালির জন্য নয়, প্রকৃতপক্ষেই এসবের দরকার ফুরিয়ে যায়নি এখনও। তার পরবর্তী বাংলা লেখালিখির সময় থেকে অবশ্যই তুলে আনা যায় সুদীর্ঘ একটি তালিকা। গল্প নিয়ে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেরই কথা—'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। সেই অশেষ ধারাটিকে প্রকৃতপক্ষে কোনও সীমার

বাঁধনে রাখা সম্ভব নয়। কারণ, বাংলা গদ্যের হাজার-লক্ষ পাতা, বিচিত্র মন, পরিস্থিতি আর চরিত্র বিস্তারে কাজে লেগেছে, লাগছে আজও। আদি-মধ্য-আধুনিক ইত্যাদি পর্ব বিচার দিয়ে যদিও সময়ের দিক্-চিহ্ন বুঝতে সুবিধা হয় কিন্তু বাংলা গদ্যের বিচরণ সীমা তাতেও থেমে যায় না। আদিগন্ত বিস্তৃত সেই গদ্যের গতি কখনও ডিঙি নৌকায়, কখনও তিন চাকার রিকশায়, কখনও বা বিভিন্ন ধরনের চারচাকার চলনেও সীমায়িত নয়, উড়েছে বিমানেও। লেখা হয়েছে কত রকমের গদ্য। উপন্যাস-গল্প-নাটক-রম্যরচনা ছাড়িয়ে নিত্যদিনের সংবাদপত্রের বিচিত্র প্রয়োজন মেটাতেও কাজে লাগছে রকমারি ধাঁচের গদ্য। এসব শুধুই গদ্য রচনার দৈনন্দিন তালিকা উল্লেখের জন্য, বিশ্লেষণের বিস্তীর্ণতা এই লেখায় সম্ভব নয়। সেখানে রয়েছে শরৎচন্দ্র থেকে শরদিন্দু পর্যন্ত আশ্চর্য একটি মিশ্র এবং অপ্রতিরোধ্য গল্পের স্রোত আর বিস্ময়কর রকমারিত্ব। গদ্যের নিয়মিত পাঠক তা বিলক্ষণ জানেন। স্টাইল কিংবা প্যাটার্নের দুধের স্বাদকে ঘোলে মেটানো যায় না, তাও পাঠকের অজানা নয়। কারণ যাবতীয় লেখালিখির বিচারক তাঁরাই। তাঁদের বিচারপর্বেই লেখকের প্রকৃত পরিতৃপ্তি চিহ্নিত হয়। পাঠকের সমালোচনাতেই লেখক বা লেখিকা সন্তুষ্ট কিংবা উদ্বিগ্ন হন। লেখককেও বুঝতে হয়, কোথায় তাঁর ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

পাঠক কী চাইছেন, তার পাশাপাশি মনে রাখতে হয় একটি জরুরি কথাও। কথাটি হচ্ছে—কী লিখব, কেন লিখব। ঠিক এই কথাটি নিয়েই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি বই আছে। সযত্নে পড়েছি বইটি। সুতরাং গদ্য রচনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানী মনোভাব থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ইদানিংকার সময় পর্যন্ত বাংলা গদ্যের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে নানা কারণে নানাভাবে গদ্যরচনার বৈচিত্র্য এসেছে। এর কারণ বিষয়বস্তু। সবসময়েই বিষয়ের বৈচিত্রে গদ্যভঙ্গিরও রূপ পাল্টেছে। অর্থাৎ চলন পাল্টেছে। একটু স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখলে তা খুব সহজেই চোখে পড়বে। বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে লিখতেন, রবীন্দ্রনাথে এসে স্বভাবতই সেই ধাঁচ এবং গড়ন পাল্টেছে। সহজ হয়েছে শব্দ ব্যবহার। আর সেই শব্দের বদল ঘটে যাওয়ায় স্বভাবতই বদল ঘটেছে গদ্যভঙ্গীর। সহজ ভাষায় একেই চলন বলা ভালো। রবীন্দ্রোত্তর পর্বে সেই চলা এবং বলা দুয়েরই বদল চোখে পড়েছে বাঙালি পাঠকের। এর বড়ো কারণ, গদ্য লেখকের সংখ্যা এই সময় থেকেই বেড়েছে অনেক গুণ। লেখকদের মেজাজ ও মর্জির সঙ্গে পাল্লা দিতেই বিচিত্র হয়ে উঠেছে বাংলা গদ্যও। চারপাশের সময় আর গতি পাল্টে দিয়েছে গদ্যকেও।

সময় আর গতি সবক্ষেত্রেই যথেষ্ট জরুরি। এককথায় প্রবহমানতা। ইংরেজির গালভরা বিশ্লেষণ 'ডায়নামিক'। গদ্যের এই গতি আর প্রবাহ থেকেই বাংলা সাহিত্যের গদ্যেরও ধারাবাহিকতা কিংবা পর্ববিভাজনকে আঁচ করা সম্ভব। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি থেকে গদ্য ধাপে ধাপে পৌঁছে গেছে বিমল মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর প্রমুখ লেখকদের চৌহদ্দি পেরিয়ে মতি নন্দী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু আর সমরেশ মজুমদার পর্যন্ত। অতএব

সাহিত্যের এই যাত্রাপথটি নিঃসন্দেহে একই দূরবীন দিয়ে দেখা নয়। কারণ, এগিয়েছে সময়। আর সময়ের সঙ্গেই সঙ্গী হয়েছে অবধারিতভাবে পরিপার্শ্ব আর মানুষজন। সাহিত্যের গদ্যে যাকে বলা যায়, কুশীলব।

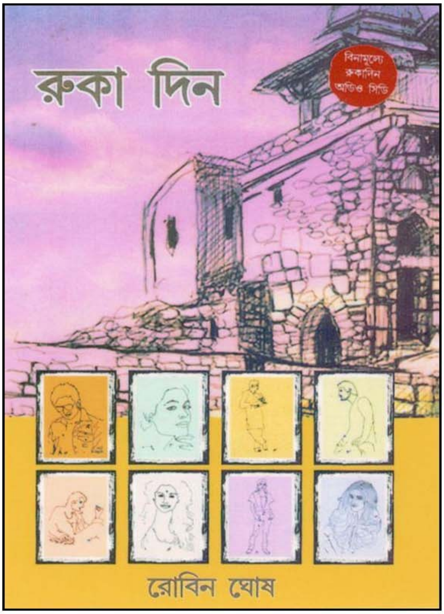
যদিও কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবনের আলোড়ন শুরু, তবুও তিনি লিখে গেছেন পাতার পর পাতা ভালো লাগার অফুরান গদ্য। নির্বিচারে তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সূচনায় শক্তি-সুনীলের কবিতা বলতে বাংলা সাহিত্যে রীতিমতো হইচই। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট এবং স্থায়ী দাগ কেটে যাওয়ার কারণগুলি সত্ত্বেও সম্ভবত বাংলাসাহিত্য একটু সরে আসার জায়গা খুঁজছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সেই সরে আসার জায়গায় যথেষ্ট জোর নিয়েই সটান দাঁড়াতে পেরেছিলেন। তাঁর 'আত্মপ্রকাশ' থেকে 'প্রথম আলো' সেই পর্বে তাঁরই একটি উপন্যাসের নামের মতোই সগর্ব ঘোষণা 'আমিই সে'। তাঁর গদ্যের সবথেকে শক্ত চাবিকাঠি—সহজতা। নীললোহিত ছদ্মনামের লেখাগুলি সহ সহজভাবে সহজ কথাটি বলতে পারাই ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা গদ্যের বড়ো পরিচয়। সেই ধারা আধুনিক পর্বের বাংলা গদ্যকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করেছে। বিতর্ক ও মতান্তর ঘটেছে বিস্তর, তবু তাঁর সুবিপুল গদ্যভাণ্ডার বাঙালি পাঠকের ঘনিষ্ঠতাও আদায় করে নিতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। তাঁর শেষযাত্রার দিনে সমরেশ মজুমদার শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, সমরেশ বসু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রাজা এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রিন্স মনে রেখেই বলছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সকলের কাছে 'সুনীলদা'। এই মন্তব্যের সময় শীর্ষেন্দু পাশেই ছিলেন, যতদূর মনে পড়ছে।

এভাবে বহুপঠিত বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য পাতায় গদ্যের ভূমিকা শুধু বাহন হিসাবেই নয়। পাশাপাশি বিচিত্র গদ্যরীতির মাধ্যমে পাঠকের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার বিস্তার ঘটাতেও সক্ষম হয়েছে। বাংলা কবিতায় নমনীয় লাবণ্যের পাশে প্রয়োজন ছিল ঋজুতারও। সেইসব গদ্যবৈচিত্রের চুলচেরা বিচারের দায়িত্ব সমালোচকরাই পালন করেছেন। ভাবতে অসুবিধা হয় না যে, সেইসব তর্ক-বিতর্ক ও প্রশস্তির অগুনতি পাতাও গড়ে উঠেছে গদ্যকে বাহন করেই।

বাংলা গদ্য রচনার এইসব অবিস্মরণীয় কারিগর পাঠকদের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদী সমীহ আদায় করে নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের অজস্র নানামুখী গদ্যের কাছে মিলেছে বৈচিত্রের স্বাদ। হাজার হাজার পাতার এইসব গদ্য রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনির্বাণ প্রদীপের সলতে পাকানোর সময় থেকেই সমুজ্জ্বল রয়েছে। কালে কালান্তরে বাংলা গদ্যের পাঠক সেই সুবাদে ঋণী এবং গর্বিত সন্দেহ নেই।

রুকা দিন

রোবিন ঘোষ



'রুকা দিন'... থমকে থাকা সময়...

ষাটের দশকে দিল্লির প্রবাসী বাঙালি পরিবারের কয়েকজন তরুণ তরুণীর জীবন যাপনের কাহিনী...

প্রবাসী বাঙালিদের ভাষায় মিশে যাওয়া অন্য ভাষার শব্দধারায় বিচিত্র সুন্দর এক ভাষায় লেখক লিখেছেন তাঁর উপন্যাস নামের ভাষাতেই যার পরিচয়।

'রুকা দিন'—ষাটের দশকের দিল্লির প্রবাসী বাঙালি যুবক যুবতীর সম্পর্ক, যন্ত্রণা, সমস্যা ও উপলব্ধির কথা...

বাংলায় প্রথম শ্রুতি উপন্যাস শোনার জন্য ক্লিক করুন
www.rukadin.com

পরিবেশক :

লিপিকা

৩০/১-এ, কলেজ রো

কোলকাতা - ৭০০০০৯

গল্পগ্রন্থ 'অন্তত একজন' ও প্রভাস ভদ্র

সিরাজুল ইসলাম জীবন

প্রভাস ভদ্র। একজন যশস্বী লেখক। একজন যথার্থ জীবন-শিল্পী। খুব বেশি লেখেননি। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পে সংখ্যা বা পরিমাণ বড় কথা নয়, উৎকর্ষই চরম বিচার্য বিষয়। 'অন্তত একজন' তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থ।

আমাদের সাহিত্যে গল্পের অভাব না থাকলেও কালজয়ী ছোটগল্প খুব সহজলভ্য নয়। প্রভাস ভদ্রের গল্পে সেই কালজয়ী ছোটগল্পের দেখা পেলাম। একান্ত শখের বশে তিনি গল্পের জগতে আসেননি। মস্তিষ্কপ্রসূত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে প্রতিটি গল্পে। এবার দৃষ্টি রাখি তাঁর 'অন্তত একজন' গল্পগ্রন্থে।

এক জনপদ রূপান্তরের জীবনালেখ্য হলো গল্প—'কালের কুশীলব'। ইংরেজ আমল এবং পরবর্তী স্বাধীন স্বদেশের নিখুঁত জীবনচিত্র এঁকেছেন লেখক। ব্রিটিশদের হটিয়ে স্বাধীন দেশের সৃষ্টি হলেও সাধারণ মানুষ কীভাবে নব্য শোষক গোষ্ঠীর কবলে পড়ে তাই-ই এ গল্পের উপজীব্য বিষয়।

ছোটগল্পের চেয়ে উপন্যাসের লক্ষণ বড় বেশি স্পষ্ট মনে হয়। লেখকের চিন্তায় কেন যে এই গল্পটি উপন্যাসের দিকে ধাবিত হলো না, তা বোধগম্য নয়।

'তিন ধাপ সিঁড়ি ও স্বজন' গল্পে লেখক তিন প্রজন্মের মূল্যবোধগত পার্থক্য চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের শুরুর দিকে স্বজনকেই মনে হয় প্রধান ভূমিকায়, কিন্তু দীনু জ্যাঠার আবির্ভাব হবার সঙ্গে সঙ্গে সবটুকু ফোকাস চলে যায় তার দখলে। লেখকের একটি বিশেষ পরিকল্পনার অংশ এই দীনু জ্যাঠা।

তিনি বলেন—'ডাক্তারির তিনটি মূল কথা—চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা। সেদিক থেকে বিচার করলে হালের ডাক্তারগণ তো এক একটি ক্রিমিনাল বিশেষ। নইলে ভাবতে পারো, মাত্র আঠাশ বছর বয়সের ডাক্তার নাতি আমার কখনও ফ্ল্যাট কিনতে পারে?'

'জাতপাত' গল্পটি প্রভাস ভদ্রের অসাধারণ নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াস। এককালের 'ভট্টাচার্যি বামুন' পরিবারটি কীভাবে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে... তাইই এই গল্পে মূল উপজীব্য বিষয়। কমলাকান্ত ও চপলাকান্ত... দুই ভ্রাতার পারিবারিক মণ্ডল ঘিরে গল্প এগিয়েছে।

গল্পের শেষের দিকে এই বংশের শেষ প্রতিনিধি চঞ্চল চাকরির পরীক্ষায় ফেল করে সেই যে টেবিলের উপর মাথা নোয়ায়, তা আর চপলাকান্ত স্নেহের হাত দিয়েও ওঠাতে পারেনি। আসলে ফেল করেনি, রাষ্ট্রীয় সিস্টেমের কাছে হেরে গেছে চঞ্চল।

লেখকের ভাষায়—'চপলাকান্তের মনে হল, যেন দারিদ্রপীড়িত ভট্টাচার্যি বামুন পরিবারটিই মাথা নুয়ে কাঁদছে।'

তাঁর 'দিনকাল' গল্পটা এমন—এই গল্পের শুরু হয়েছে চমৎকার নাটকীয়তায়। শুরুর ইঙ্গিতও সাধারণ।

এই গল্পে উপন্যাসের লক্ষণও ফুটে বেরিয়েছে।

'দিনকাল' গল্পের সমাজ চিত্র একদম দর্পণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পিতৃহীন চিতেন-হিতেন চাচার আনুকূল্যে বড় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অনেক সংগ্রাম করে ওরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। সমাজে উঠতি টাকাওয়ালাদের সংসারজীবন কেমন—তা দুই ভাইয়ের জীবনাচার থেকে নির্ণীত হয়।

'নামযশ' গল্পেও উঠে এসেছে সমকালীন সমাজ বাস্তবতা। কী করে বংশীয় ঐতিহ্য চাষবাস থেকে মানুষ ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে— তার বিশ্লেষণ। বাবা পাঁচু মুদি বা পঞ্চুচরণের ছেলে বিষ্ণু চরণ ওরফে বিষ্টু মুদি ও তার ছেলে শ্রীযুক্তবাবু জগৎ চরণ মালাকারের 'কান জগা' হয়ে ওঠার আশঙ্কা 'নামযশ' গল্পের বিষয়বস্তু। দেশ বিভাগের ওলটপালটের চিত্রও এই গল্পে স্থান পেয়েছে। দেশ বিভাগ যেমন অনেককে নিঃস্ব করছে, তেমনি আবার অনেককে আঙুল ফুলে কলাগাছ বানিয়েছে।

প্রভাস ভদ্রের গল্পগুলো একদম জীবন থেকে নেয়া।

'সাঁকো' গল্পের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে কাজের মেয়ে অষ্টমী। হঠাৎ বায়না ধরে অষ্টমী... গ্রামে যাবে, মনে পড়ে তার অঘ্রানীকে। শোণিমা খুব টেনশনে পড়ে—একবার গেলে যদি আর না ফিরে...। তাই প্রিয়ঙ্ক এক সকালে অষ্টমীকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য সঙ্গে করে আবার অষ্টমীকে নিয়ে ফিরে আসা। বাসে বসে তন্দ্রালু চোখে ভাবছিল। মাটির দাওয়ায় পা ছড়িয়ে গর্ব কথা শোনাবে, 'মোকে নিয়ে বৌদিমণির সঙ্গী দাবাবুর কী যে বাদবিতণ্ডা। বৌদিমণি বলে কিনা, কাজের লোককে সঙ্গে নে যেতে লজ্জা করবেনি? লোকেই বা কী ভাবব্যে। তারচে চেনা নোক দ্যে পেইঠ্যে দাও। দাবাবুর হক কথা অষ্টকে কতা দিইচি, বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারবনি। তা শেষমেশ এলেন তো বটে।'

এই ভাষা অসাধারণ। কর্ণকুহরে ঝর্ণার মতো মাদকতা এনে দেয়। এমন প্রাণময়তা প্রিয়ঙ্কর বোধের জগৎকে স্পর্শ করে যায়।

এরকম চরিত্র নির্মাণ একজন লেখকের কাছে এভারেস্ট জয়ের মতো। প্রভাস ভদ্র হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়ে অষ্টমীকে সৃজন করেছেন। অষ্টমীর গল্প আর ফুরোয় না। কিন্তু মুমুর্ষু স্বামীর জন্য তার মানবিক অনুভূতি লাফিয়ে ওঠে। তাই অষ্টমী স্বামীর বাড়ি যায়। শোণিমার আশঙ্কাই সত্যি হলো। প্রিয়ঙ্কর আসাও বিফলে গেল। মুমূর্ষু স্বামীকে রেখে প্রিয়ঙ্কর বাসায় ফিরতে পারলো না সে। অষ্টমী কেবল প্রিয়ঙ্ককে বললো...'বৌদিমণিকে বুঝ্যে বলবিন। লিজির চোকে দেকতি পারচেন তো। ইভাবে ফেলি যাব ক্যামন করি?

বাংলা কথা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম ফরাসী সাহিত্যের চেতনাবাদ নিয়ে আসেন। সেই চেতনাপ্রবাহ রীতি উঠে এসেছে প্রভাস ভদ্রের 'মরণাশৌচ' গল্পে।

যন্ত্র যুগের এই বিচ্ছিন্নতা মানুষকে যে চরম স্বার্থপর করে তুলেছে... এই মিথ ভেঙে দিয়েছে গল্পের দুই চরিত্র আকাশ এবং অনির্বাণ।

লেখকের অবশ্যই অন্তর্দৃষ্টি থাকতে হয়। ঘটনার আড়ালের ঘটনা কী... সেই ব্লাকহোলে আলো ফেলতে হয়। তবেই দৃষ্টিগোচর হবে সব রহস্য। প্রভাস ভদ্রের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই লেখকের দর্শন-চিন্তাও মৌলিক। তাই তাঁর 'চিরাচরিত' গল্পটি যেন সমাজ-সভ্যতার মূল ধরেই টান দিয়েছে। সভ্যতার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে পদীবুড়ি চরিত্রটি। এই গল্পের ঘটনা প্রবাহ নির্মাণে একজন সাংবাদিক এবং এই পদীবুড়িকেই অবলম্বন করেছেন লেখক। পদীবুড়ির আঞ্চলিক ভাষার জবানবন্দি যেন প্রচলিত সমাজ-সভ্যতার গালে অজস্র চপেটাঘাত বসিয়ে দিয়েছে।

গতিপ্রকৃতি গল্পে উঠে এসেছে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নানা অসঙ্গতির নির্মম চিত্র। দুর্বল রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কীভাবে দুর্নীতি জেঁকে বসেছে... ফলশ্রুতিতে মানুষ এবং পরিবারে কী দুর্বিসহ পরিস্থিতি তৈরি হয় তার চালচিত্র।

এই গল্পে দেখানো হয়েছে হাসপাতালের করুণ চিত্র ও দুর্নীতি কতটা গভীরে প্রোথিত, তা।

'গতিপ্রকৃতি' গল্পে ইঙ্গিতের চেয়ে বিশ্লেষণ বড় হয়ে উঠেছে। হাসপাতালের চিত্র এবং সরকারি অফিসের চিত্র...আলাদা দুটো গল্প হতে পারতো। একসঙ্গে হওয়ায় ছোটগল্পের একরৈখিক বৈশিষ্ট্যে ছেদ পড়েছে। ইঙ্গিত-ধর্মই ছোটগল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। ইঙ্গিতের চেয়ে বিশ্লেষণ বেশি প্রতিভাত হওয়ায় গল্পটির শিল্পমান পুরোপুরি অটুট থাকেনি বলা যায়।

পৃথিবীতে কোনো কোনো মানুষ মন্দভাগ্য নিয়ে জন্মায়, আবার কোনো কোনো মানুষ অতিভাগ্য নিয়ে জন্মায়। ঠিক এমনি একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন প্রভাস ভদ্র তাঁর 'সর্বজনীন' গল্পে।

'অন্তত একজন' গল্পগ্রন্থের নাম-গল্পের ভূমিকায় রয়েছে 'অন্তত একজন' গল্পটি। এই গল্পে একটা আদর্শিক সংগ্রাম রূপ লাভ করেছে। যার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন গোকুলচন্দ্র চরিত্র। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন অগ্রসেনানী এই গোকুলচন্দ্র। তেরোজন দুর্ধর্ষ ইংরেজকে হত্যা করে যিনি জেলে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে জেল থেকেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এমন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্রিটিশ-মুক্ত স্বাধীন দেশে আদর্শিক দিক থেকে একা হয়ে গেলেন।

তাঁর কথায় : 'যে কোনও ভিত্তিতে মানব জাতিকে বিভাজন মাত্রই সাম্প্রদায়িকতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও ভারতবর্ষের আপামর মানুষ মিলে একটা জাতি হয়ে উঠতে পারল না। এখনও দেশ জুড়ে জাতপাতের ভিত্তিতে ভোট হয়। এই যে বিভিন্ন পার্টির লোক বলে পরিচিতিতে বিচ্ছিন্নতা হানাহানি খুন হিংসা... এসব কি বিভেদ সাম্প্রদায়িকতার পর্যায়ে পড়ে না?'

গোকুলচন্দ্রের এই নীতিকথা স্বাধীন দেশে অচল। তাইতো থানার ওসির অকপট কথা—'স্বাধীনতা সংগ্রামীর সেন্টিমেন্টটা সিকেয় তুলে রেখে মূলস্রোতে মিশে যান।'

মূলস্রোতে মিশে যেতে পারেননি গোকুলচন্দ্র।

দুইশত তিন পৃষ্ঠার বড় কলেবরের গল্পগ্রন্থ—'অন্তত একজন'। মোট বারটি গল্পের স্থান হয়েছে বইটিতে।

অসাধারণ কিছু চরিত্রের দেখা মিললো এই গ্রন্থে। তাদের মধ্যে অষ্টমী, কুড়ানী, পদীবুড়ি, গোকুলচন্দ্র উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের ভাষা কখনো কাব্যিক, কখনো সুঠাম, কখনো ঋজু, কখনো আঞ্চলিক সহজ-সরল রেখায় এগিয়ে গেছে। তবে ভাষায় ইঙ্গিত স্পষ্ট। ভাষা সর্বত্রই কথা হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু গল্পে উপন্যাসের লক্ষণ ফুটে বেরিয়েছে। ছোটগল্প হিসেবে দু'একটি দুর্বল মনে হয়েছে। আবার বেশ কিছু গল্প অসাধারণ ছোটগল্পের মানদণ্ড হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে সাঁকো, চিরাচরিত, কালের কুশীলব গল্পের শিল্পগুণ বিস্ময়কর। অন্তত একজন গল্পগ্রন্থ বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে আলাদা করার মতো সংযোজন। নিঃসন্দেহে 'অন্তত একজন' গল্পগ্রন্থ প্রভাস ভদ্রের মূল্যবোধ ও চেতনা প্রবাহ রীতির এক উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী নিদর্শন।

শূন্যতায় সম্পূর্ণ হয়ে থাকা

অনুপকুমার আচার্য

বেঁচে উঠতে চাই : দেবদত্ত ভট্টাচার্য। প্রোরেনাটা প্রকাশনী, হাওড়া-৭১১১০২। মূল্য ১০০ টাকা।

বিষয়ের নিরিখে কবিতার ব্যাপ্তি কোনোকালেই সীমিত ছিল না। পরিসর বহুধাবিস্তৃত। চলাচল সর্বত্রগামী। বলা যায়, রবীন্দ্র পরবর্তী কাব্যজগতেই তার সূচনা। আজও কবিতার গতিপথ অফুরান। অনিঃশেষ তার পথচলার বাঁক। হ্যাঁ, প্রযুক্তির এলোমেলো বাতাসেও!

কথাগুলি দীর্ঘ বিরতির পর একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতার সারসত্য। আলোচ্য কবি দেবদত্ত ভট্টাচার্য বয়সে প্রবীণ। কাব্যবোধেও পরিণত। 'বেঁচে উঠতে চাই' —তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ। এবং সম্ভবত দ্বিতীয়। কবিতার গার্হস্থ্যে বহুদিন অতিবাহিত করেও, গ্রন্থসংখ্যা মানানসই নাও হতে পারে। এহ বাহ্য। কাব্যকৃতিতে তিনি কিছু পশ্চাদগামী নন। এই গ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় তার স্বাক্ষর আছে।

বইটির উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন—'প্রকৃতি ও মানুষকে যাঁরা ভালবাসেন।' অর্থাৎ প্রকৃতি যে তাঁর কবিতায় যাবতীয় রূপ রস গন্ধ বর্ণের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, সন্দেহ কী! শুধু প্রকৃতি নয়, প্রকৃতির নিজস্ব চরিত্রেরা উঁকি দেয় তাঁর কবিতায়। আত্মসর্বস্ব সময়, দুঃস্থ জীবন এবং যাপন স্বাভাবিক কারণেই কবিকে ক্লান্ত করে। অবসন্ন করে। অরণ্যের কাছে পাহাড়ের কাছে রূপমুগ্ধ কবির প্রহর কাটে। প্রকৃতির পরিচর্যায় সময় সভ্যতার অনিবার্য ক্ষত নিরাময় লাভ করে। নিবিড় শুশ্রূষায় কবি বেঁচে উঠতে চান। কবি ফেরেন নিজের কাছে। টের পান, 'সমতল পাহাড় নয় তবু যেন কত অসমান' (সমতল কত অসমান)। সব দেখাই নতুনতর ব্যঞ্জনা লাভ করে, তা নয়। তবু, আত্মোপলব্ধির এক টুকরো সহজ পাঠ সম্পন্ন হয়।

জীবন ও সময়ের বহুবিধ কোণে নিরন্তর আলো ফেলে তাঁর কবিতা। সচেতন কবি উচ্চকিত নন কখনও। এমনকি, প্রতিবাদী মুহূর্তেও। শব্দভাণ্ডারেও মৃদু পরিশীলিত শব্দের সমাহার। বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রতি অকারণ আসক্তি স্পষ্ট নয় কোথাও। বাক্‌ভঙ্গিতেও অহেতুক চমক নেই।

শুধু সামাজিক পরিচিতির গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেন না কোনো সৎ কবি। বরং সচেতন দায়বদ্ধতার নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকেন বলে বহুবিধ দৃষ্টিকোণ সংযোজিত হয়

কবিতায়। কবিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। প্রসারিত হয় কবির কাব্যদর্শন। জীবন ও সময়ের ব্যাখ্যায় এবং ভাষ্যে ফুটে ওঠে কবির স্বকীয়তা। শক্তিমত্তা।

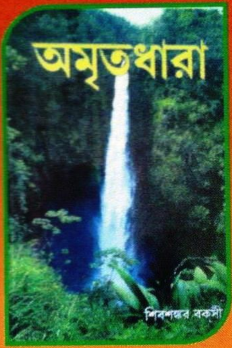
জীবনের সহস্র উপকথা—জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, কর্ম-অকর্ম, লাভ-লোকসানের অনুপুঙ্খ খতিয়ানও উহ্য থাকে না তাঁর কবিতায়। কখনও পাখি হবার দুর্মর আর্তি বেজে ওঠে কবির কণ্ঠে। আবার বিয়াল্লিশ বছর আগে মুম্বাই হাসপাতালের নিগৃহীতা, ধর্ষিতা নার্স অরুণা শানবাগের দীর্ঘ কোমার অবসান ঘটে সাম্প্রতিক মৃত্যুতে। সেই ঘটনার স্মরণে ও প্রতিবাদে ঝলসে ওঠে তাঁর কলম—'আগুনপাখি' কবিতায়।

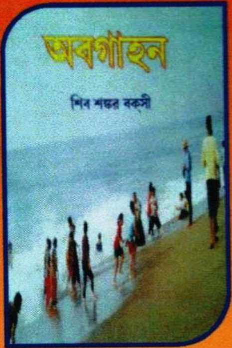
আকণ্ঠ নিমজ্জিত কবির কাছে উত্তরণের পথ অচেনা নয়। বেদের ভাবানুষঙ্গ, রবীন্দ্র-দর্শন এইসব মুহূর্তে তাঁকে প্রাণিত করে। 'অন্নপান' কবিতায় কবির উচ্চারণ, 'অন্ন নয় একার, অন্ন সবার, সমান'—সুসম ভাবনার হলেও, কবিতার পূর্ণতর আস্বাদ পাওয়া যায় 'শূন্যময়' কবিতায়। 'শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। কেউ নেই।/শূন্যতা পূর্ণ হয়ে আছে ঘরময়।' পরিণত বোধের কাব্যিক উচ্চারণ মুগ্ধ করে। একটু পরেই তিনি বলেন, 'এভাবেই অনন্ত শূন্যতায় সম্পূর্ণ হয়ে আছি।' সংকলনের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কবি চিরায়ত প্রেমে দ্বিধাহীন। দেহান্তের পর এমনকি, দহনান্তেও কবির 'দিব্যি বেঁচে ওঠায় নাটকীয়তা থাকলেও কাব্যভাবনা টাল খায় না বরং অন্তহীন অসহায়তা, আহত আত্মার নিরাময় শেষে তিনি যখন বলেন, 'যখন যাব চলেই যাব এখন থেকে তাড়া কিসের?' আমাদের বর্ষণক্লান্ত আকাশের কোণে রোদের হাসি ঝিলিক দেয়। স্বস্তির মুখাবেশও।

কাব্যগ্রন্থটির ছাপা-বাঁধাই ভাল। দ্বিতীয় প্রচ্ছদে কবি-পরিচিতির সহজবোধ্য ভুলটি ছাড়া আর একটি মুদ্রণ প্রমাদ নজরে পড়ে। উপেক্ষণীয়। প্রচ্ছদ সুন্দর। সময়ানুগ।

শিবশঙ্কর বক্সী-এর গ্রন্থাবলী





কাব্যগ্রন্থ :

অমৃতধারা

অবগাহন

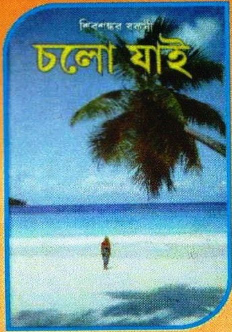
ভ্রমণ :

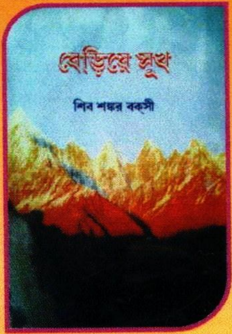
চলো যাই

বেড়িয়ে সুখ

চলো বেড়িয়ে পড়ি

বেড়াতে বেরিয়ে





প্রকাশের অপেক্ষায়

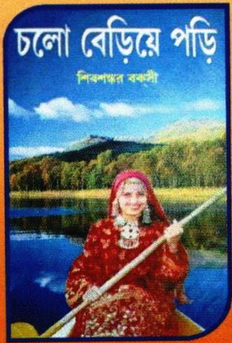
উপন্যাস :

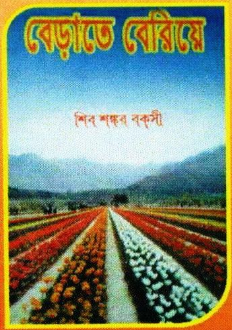
মধুরেণ

ভ্রমণ :

সাপ্তাহিক

বেড়াবার বই





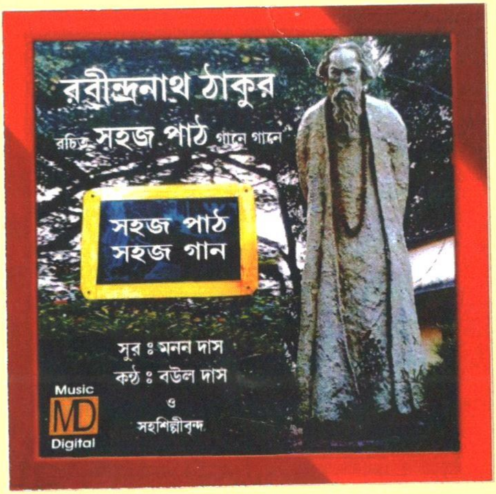
প্রকাশক :

সাগরিকা পাবলিশার্স, ১০এ, কলেজ রো, কল – ৯

ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী, ৮-৬এ, কলেজ স্ট্রীট, চৌমাথা,

ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা – ৭৩

Krishanu Quaterly
Vol XXXXXI/II
Rs. 130.00
Regd No.
R. N. 16533/68



সহজ পাঠ–এর আঠেরোটি কবিতা
সুরে সুরে গানে গানে...

সুর ও পরিচালনা – মনন দাস

কণ্ঠ – বউল দাস

সহশিল্পীবৃন্দ :
দেবারতি ভট্টাচার্য, পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সায়নীতা রায়, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়,
মৌসুমি নাথ ও শিপ্রা দে।
শোনার জন্য এই লিঙ্কয়ে ক্লিক করুন :
www.archive.org/details/SahajPath

মদন দাস কর্তৃক ৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও বাণী আর্ট প্রেস, ৫০এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা - ৯ হইতে মুদ্রিত।